পল্লী-শ্রী

[আদর্শ পল্লীচিত্র]

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়-

প্রণীত

মূল্য এক টাকা চারি আনা

পল্লী-শ্রী

প্রিভি কাউন্সিলের শেষ মকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া জগদিন্দু মুখোপাধ্যায় আজ কয়মাস সকল ভাবনার শেষ করিয়া বসিয়া আছে। মাতুল শ্রীধর ঘোষাল কয়মাস ধরিয়াই নানাপ্রকার সৎপরামর্শে তাহাকে আবার একটা নূতন মামলা রুজু করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

শ্রীধর অনেক কষ্টে পুরাতন, পোকায় কাটা একখানা কৃত্রিম দেবোত্তরের দলিল সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই দলিলের সাহায্যে বিষয়ের দাবীতে মোকদ্দমা করিলে, সমস্ত না হইলেও লুপ্ত জমিদারীর যথেষ্টাংশ পুনরুদ্ধার করা যায়। শুধু শ্রীধর কেন, জেলার বড় বড় উকিলগণও সেই বিষয়ে নিশ্চিন্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু জগৎ কিছুতেই মাতুলের নিঃস্বার্থ হিতোপদেশ গ্রাহ্য করিল না।

কাজেই—স্ত্রী, কন্যা এবং বৃদ্ধা জননীর হাত ধরিয়া অচিরে জগদিন্দুকে পথে দাঁড়াইতে হইবে। তথাপি সে অচল, অটল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

মাতা সত্যভামা দুশ্চিন্তায় অশ্রু সার করিয়াছেন; কিন্তু গৃহলক্ষ্মী অনুশীলার কোনও দুর্ভাবনাই নাই, স্বামীর সঙ্গে বিষয়-বিষের

সকল মাদকতার মোহ ত্যাগ করিয়া তিনিও পথে দাঁড়াইতে প্রস্তুত হইয়া আছেন।

প্রাবৃটের ঘণ তমসাবৃত বাদলার মেঘমালা ছিন্ন করিয়া পূর্ব্ব গগনপ্রান্তে রক্তিম রাগে ভগবান অংশুমালী উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন। ভগ্ন, আর্দ্র, বিক্ষিপ্ত বৃক্ষপত্র-পুষ্পে, কর্দ্দমাক্ত শ্যামল তৃণ-দলোপরে, প্লাবন-জল-প্লাবিত প্রান্তর-হ্রদে, কুলায়-বিহীন আকুল বিহঙ্গের সিক্ত পক্ষ-পুচ্ছে—বালার্ক কিরণ সঞ্জাত অলক্তক রাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সাতদিন-ব্যাপি বর্ষণ ও ঝঞ্ঝার পর তিমিরারির প্রথম সাক্ষাতে বিহঙ্গকূজনের সঙ্গে শিশুগণের সঙ্গীত-সুর মিলিয়া পল্লীগৃহ-প্রাঙ্গণ, কুঞ্জ-কানন, প্রান্তর পথ—আবার নবীন উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিয়াছে।

এমন সময় জগদিন্দুর বহির্বাটিপ্রাঙ্গণে তাঁহার কন্যা দুয়িতা শত্রু-পুত্র শ্যামলের চক্ষু বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে 'কাণামাছি' খেলিতে ছিল।

শিক্ষা ও স্বভাবের গুণে কোমল শিশু দুইটির যুগল হৃদয়ে তখনও বিদ্বেষের হলাহল উপ্ত হইয়া উঠে নাই। অভিন্ন সৌহার্দ্দের দৃঢ় বাঁধনে বদ্ধ শিশুদ্বয়ের প্রাণে তখনও মলিনতার সৃষ্টি হয় নাই।

বিমল আনন্দে আপন ভুলিয়া উভয়ে খল খল হাসির উচ্ছ্বাসে, চল চল সঙ্গীততরঙ্গে,—আদর, আবদার, অভিমানের অমৃত উৎসে গা ঢালিয়া দিয়াছে।

ধীরে ধীরে জগদিন্দু চণ্ডীমণ্ডপের দালানে আসিয়া বসিল। আপন প্রাণের দ্বন্দ্ব অসূয়ার সহিত শিশুহৃদয়ের নির্ম্মল, অভিন্ন

ভাবের তুলনা করিয়া সে বিমর্ষ হইল। এমন সময় তাঁহার বাল্যসুহৃদ ভজহরি—

আমি পাগল কি মনটা পাগল—না পাই ঠিকানা,—
সাত পাগলে পাগল কর্‌লে কেউ ত বোঝে না॥

গাহিতে গাহিতে, প্রভাতী স্নিগ্ধতার মধ্যে সুরলহরীর প্রাণ ঢালিয়া দিয়া চণ্ডিমণ্ডপে জগদিন্দুর পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল।

ভজহরি একটা বাতিকগ্রস্থ উদ্ভট জীব। কিন্তু তাহার সঙ্গীত-জ্ঞান এবং ভাবপ্রবণতার সীমা নাই।

বিমল আনন্দে জগদিন্দু ভজহরির সঙ্গীত-সুধাপানে বিহ্বল হইয়া শিশুযুগলের প্রাণঢালা হাসি খেলার অভিনয় উপভোগ করিতে লাগিল।

শ্রীধরবাবু হুকাহস্তে তথায় আগমন করিলেন। দক্ষিণ হস্তে ধুমপানযন্ত্রটির নল্‌চে ধারণ পূর্ব্বক মুষ্টিবদ্ধ বাম হস্ত হাঁটু ও উরু প্রদেশের মধ্যে স্থাপন করিয়া কুঞ্চিত-ললাট, বক্র ভ্রূযুগ-বিধ্বস্ত বদনমণ্ডল ঈষৎ দক্ষিণে হেলাইয়া ভাব-নিবিষ্ট চিত্তে কিয়ৎকাল তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন।

সত্যভামা দেবীও ভ্রাতার পশ্চাতে সাজিভরা তুলা পাঁজ করিতে করিতে আসিয়া সেখানে বসিলেন। অপক নিদ্রার জড়তা এবং বিষম দুশ্চিন্তার কালিমা রেখা মাতার সমস্ত অবয়ব জুড়িয়া বসিয়াছিল।

জগদিন্দু বুঝিল আবার একটা প্রবল বক্তৃতাপ্রবাহে তাহাকে ভাসাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীধরবাবু এবং জননী সত্যভামা, ঝটিকার

পূর্ব্বে ধরিত্রী যেমন গম্ভীর ভাব ধারণ করে, সেই প্রকার গাম্ভীর্য্য লইয়া সেথায় আগমন করিয়াছেন।

কৌশলে, মাতুলের চর্ব্বিত, চিক্কণ, মৃদু বাক্যপ্রবাহ এবং মাতার তীক্ষ্ণ তিরস্কার মিশ্রিত কাতর ক্রন্দন, এড়াইবার জন্য জগত ভজহরির হাত ধরিয়া বলিল,—

"চল ভজা, মাঠে মাঠে কেমন জল জমেছে দেখবি চল।"

তাহার অভিসন্ধির কথা বুঝিতে পারিয়া শ্রীধর একটা প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"জগত যেওনা। একটা কাজের কথা বলবো বলেই এসেছি আমরা।" বলিয়া তিনি জগদিন্দুর মুখের দিকে চাহিলেন।

"তা—আচ্ছা আমরা একটু ঘুরেই আসি, সাতদিনের পর এইত সবে একটু ফরসা হ'য়েছে। তুমি ততক্ষণ মুখ হাত ধুয়ে নাও।"

বলিতে বলিতে মস্তক কণ্ডূয়নশীল জগতবাবু উঠিবার প্রয়াস করিতেই সত্যভামা দেবী রাগত স্বরে তাহাকে বলিলেন,—

"ওসব পাগলামী রাখ জগত। আমরা যা বলতে এসেছি শোন, তারপর আজই যা হয় একটা বিহিত সিহিত কর—এমন কোরে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না ত?"

বিনয়-নম্রস্বরে "মা, আমার যা বলবার ছিল বলেছি। আর কি বলবো বল।" বলিয়া জগত গাত্রোত্থান করিল।

হঠাৎ গানের সুরটা একটু চড়াইয়া দিয়া, একটু কাশিয়া, একটু হাসিয়া ভজহরি "দূর পাগলা—বলা কওয়ার কি শেষ আছে রে?" বলিতে বলিতে সেস্থান ত্যাগ করিবার উপক্রম করিল।

"হ্যাঁ—যাওত বাবা ভজু, দেউরী ঘরে কেমন চন্দ্রকোণা তামাক কেটে মেখে রেখেছি। আমরা কথাটা বলে ক'য়ে নি, তুমি ততক্ষণ তামাক টামাক খেয়ে এসো ত বাবা।"

একগাল হাসির সঙ্গে কথা কয়টি বলিতে বলিতে শ্রীধর, বিরাট তৃপ্তিতে হুকা-মুখে আবার একটা বিষম টান মারিয়া, গলা শানাইয়া বসিলেন।

"তা তুই বিয়ের মন্তর ক'টা চোখ বুজে আউড়ে নে জগাতে, ততক্ষণ পেসাদটা অনুমতি হয় ত, এক টান মেরে আমি—কি বলেন ঘোষাল মশায়,—খুব চড়া গলায় ঝিঁঝিট খাম্বাজে একখানা মায়ের নাম করি।"

বলিতে বলিতে ভজহরি, ঘোষাল মহাশয়ের হস্ত হইতে হুকাটি কাড়িয়া লইল। একটি প্রবল টানে কলিকার অন্তস্তল দগ্ধ করিয়া—যাহার হুকা তাহাকেই ফিরাইয়া দিল।

পাকস্থলীতল-গত পুঞ্জীকৃত ধূম্ররাশি উদ্গীরণকরতঃ ভজু গলা ছাড়িয়া ঝিঁঝিট খাম্বাজের রূপ, ন্যাশ, লোম, বিলোম, অনুলোমাদি বিশুদ্ধভাবে আলাপচারি জ্ঞাপক 'আ—উ—হু—উ—থ্রিম—তানা' প্রভৃতি ধ্বনি করিতে লাগিল।

"ভাল আপদ! একটা কাজের কথা বলতে এলেম আমরা, আর তুই কিনা পাগলা গাধার চেঁচানি সুরু করলি—গেরো আর বলে কাকে?"

বিরাট বিরক্তিসহকারে মাতুল মহাশয় মুশড়াইয়া পড়িলেন।

"হ্যাঁ বাবা ভজু, কাল কি খেয়েছিলি বাবা? আমি কেমন

নারকল নাড়ু কোরে রেখেছি। তুই তামাক টামাক খেয়ে মুখহাত ধুয়ে নে, দিব্যি নাড়ু খাবি'খন।" বলিতে বলিতে প্রাণের ব্যথা প্রাণের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া মাতা তাঁহার বিষাদমলিন মুখে অতি কষ্টে একটু হাসি ফুটাইয়া তুলিলেন।

"তা মামী! বুলি পড়বে জগতে, আর ছোলার বরাদ্ধ পাগলার?" বলিতে বলিতে খাম্বাজ-সুর-নিমজ্জমান ভজহরি কিন্নর-কণ্ঠ-কাকলি গগনে বিকীর্ণ করিয়া আপন মনে হেলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে প্রস্থান করিল।

"আপদ গেল।" বলিয়া শ্রীধর আবার শূন্যগর্ভ কলিকায় প্রবল টান মারিয়া বলিলেন,—

"আমরা বলছিলেম কি বাবাজী, তুমি মামলাটা হেরে গিয়ে এমন নুয়ে পড়লে যে ভালমন্দ একটা পরামর্শও ত করা হলো না।

"দ্যাখ জগত—আমি তোর মা, আমার কথা তোর শোনতে হয়। আমি বলছি তুই ছিদের সঙ্গে আজই সদরে গিয়ে—"

সত্যভামার কথা শেষ না হইতেই ছোটহিস্যার কর্ত্তার শ্যালক শ্রীযুত নবগোপাল সমদ্দার মহাশয়,—নাজির, পিয়াদা, ঢুলি, পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতিসহ সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

"আর সদরে গিয়ে কিছু হবে না বড়গিন্নী—ওঁরা শেষ রাত্রেই এসে পৌছেছেন।"

বলিতে বলিতে আসুরিক হাস্যে শ্রীযুত গৃহ প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

"কি চান আপনারা এখানে ?" বলিয়া বিস্ময়-বিহ্বল শ্রীধর ঘোষাল মহাশয় অনল দৃষ্টিতে নাজির মহাশয়কে 'মদনভস্ম' করিবার উদ্যোগ করিলেন।

"ছোট তরফের বাবুর পক্ষে ডিক্রীজারিতে জগতবাবুর বাড়ীঘর, বিষয়সম্পত্তি দখল দিতে এসেছি আমরা।" বলিয়া নাজিরবাবু অবনত মস্তকে নীরব হইলেন।

"বুঝছ না মামা ? এ আর এক চাল। তা যাক্,—এই শেষ চাল ! মাত হয়েছি, আর ত খেলা চলবে না—বাস !"

কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া আবার জগত বলিল, "দেখছেন মা রয়েছেন এখানে ; আপনাদের যা করবার তাড়াতাড়িই করে যান।"

কিন্তু তখনও শ্রীধরের ক্রোধের উপশম হয় নাই। "বলি নিলেম হলো কবে যে দখল দিতে এসেছেন ওঁরা ?" বলিয়া তিনি বিহ্বল ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

"নিলেম হয়েছে আজ প্রায় দুই মাস।" নাজিরবাবু পরওয়ানা খানা বিস্ময়-আড়ষ্ঠ শ্রীধরবাবুর হস্তে দিলেন।

"জুচ্চুরি ! ইস্তাহার গোপন কোরে—"

এতক্ষণ শ্রীযুত নবগোপাল সমদ্দার মহাশয় নীরব ছিলেন। ইস্তাহার গোপনের কথা শুনিয়া তিনি কি জানি কেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। শ্রীধরের কথার মাঝখানে বাধা দিয়া তিনি বলিলেন,—

"গোপন কি ? এই যে সেদিন আমি স্বয়ং এই নন্দা চাঁড়ালকে নিয়ে ঢোল সহরত কোরে—বলনারে নন্দা।"

বাধা দিয়া নাজিরবাবু বলিলেন, "সেই সাফাই আদালতে করবেন—আমার তাতে কোন কাজ নেই। কিছু মনে করবেন না জগতবাবু! বুঝতে পাচ্ছি সব, তবু আইনের চাকর আমরা।"

বলিতে বলিতে 'ঢোল সহরত' দ্বারা প্রবল প্রতাপান্বিত কোম্পানী বাহাদুরের বিরাট প্রতিনিধি পুঙ্গব আইনের মর্য্যাদা-মাফিক স্বকার্য্য শেষ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বীভৎস উল্লাসে হতচেতন নবগোপাল জগদিন্দুবাবুকে অবিলম্বে বাড়ীঘর ছাড়িয়া প্রস্থান করিবার অনুজ্ঞা প্রদানান্তে, নন্দা চাঁড়ালের স্কন্ধ হইতে ঢোলটি কাড়িয়া লইয়া তাণ্ডবতালে তাহাতে বিষম আঘাত করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

"ওগো কর্ত্তা গো—আমায় এসে নিয়ে গেলে না গো—হতভাগা ছেলে তোমার রাজত্বি উড়িয়ে দিয়ে পথে দাঁড়াল গো।"

বিষম চীৎকারে সত্যভামাদেবী পাড়াশুদ্ধ লোক সেইখানে জড় করিয়া ফেলিলেন।

এমন সময় কন্যার হাত ধরিয়া অনুশীলা বহির্ব্বাটিতে উপস্থিত হইল।

"চল মা আর এক দণ্ডও এখানে নয়। বিষয় পায়ের শৃঙ্খল মাত্র—আজ সম্পূর্ণ মুক্ত, পূর্ণ স্বাধীন আমরা।" বলিয়া জগত অগ্রসর হইল।

"সে কি জগত? এখনও সময় আছে ত! সদরে গিয়ে, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না কোরে—ভিটে ছেড়ে যাবি কিরে?"

উদ্‌ভ্রান্ত শ্রীধর ভগ্নির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"পাগলামী করিস নি জগত। বুঝে সুজে—ছি ছি—"

সত্যভামার কথায় বাধা দিয়া জগদিন্দু বলিল,—

"না মা আর প্রলোভন দেখিও না—আজ মুক্ত আমরা। চল, ঠাকুর বাড়ীতে সবই বলা কওয়া আছে। দেবোত্তর সম্পত্তি, সেখানে আর কেউ ডিক্রীজারিতে দখল নিতে আসবে না। মামা, ওদের দিয়ে জিনিষ পত্তরগুলি ঠাকুরবাড়ী পাঠাবার বন্দোবস্ত করে এসো। চল মা—"

বলিয়া উচ্চ আর্ত্তনাদশীলা মাতার হস্ত ধরিয়া জগত শ্রীদুর্গানাম উচ্চারণে পৈত্রিক গৃহাঙ্গণ পিছন করিয়া চলিল।

ঠিক এই সময় "কেমন পেয়ারা পেড়ে এনেছি দয়ি, খাবি চ'—" বলিতে বলিতে শ্যামল আসিয়া দয়িতার হাত ধরিল।

আচম্বিতে সকলের গম্ভীর মুখ দেখিয়া সংসার জ্ঞানহীন শিশুর মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল, তাহার তরুণ বয়ানে একটা অজানা আতঙ্কের ভাষা ফুটিয়া উঠিল।

"একি তোমরা কোথায় যাচ্ছ কাকীমা?" বলিয়া সে অনুশীলার মুখের দিকে চাহিল।

"ঠাকুর বাড়ী।"

"এত ভোরে, না নেয়ে—ঠাকুর বাড়ী যাচ্ছ কেন কাকাবাবু?"

ব্যাপারটা শিশুর কাছেও কেমন অস্বাভাবিক ঠেকিল।

দয়িতা অমনি বলিয়া ফেলিল,—

"যাচ্ছি আবার কেন? যাচ্ছি ফুল তুলতে, প্রসাদ পেতে, বাজনা শুনতে, আরতি দেখতে! ঠাকুর বাড়ী আবার যায় কেন?"

বালকের প্রাণের সন্দেহ দূর হইল না। সে অধোমুখে ফিরিয়া চলিল।

"বারে! আমি পেয়ারা খাব না বুঝি?" বলিয়া দয়িতা শ্যামলের পিছনে ছুটিল।

"ওরে যাস্‌নি, যাস্‌নি, শোন—" বলিয়া অনুশীলা তাহাকে ডাকিতেই, জগত বাধা দিয়া বলিল,—

"ছি অনু, অনাঘ্রাত ফুলের কলি দুটি—এত শীগ্‌গির ওদের প্রাণে চিন্তাকীটকে বসতে দিওনা!

(২

ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ছোট তরফের প্রাতঃস্মরণীয় দানবীর, ৺মাধবগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র। তাঁহার দুইটি কন্যা ছিল। প্রথমা শান্তিময়ী অবীরা—তিনি কর্ত্তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ভোগ দখল করিতেছেন।

দ্বিতীয়া ক্ষ্যান্তকালী—শতাধিক অরক্ষণীয়া কুলীন কন্যার কুলবান্ধব ঋষভ শর্ম্মার পঞ্চাশত পক্ষের সহধর্ম্মিণী। তিনি কর্ত্তার জীবদ্দশায়ই সধবাজীবনে অকাল বৈধব্যের হাত এড়াইয়া, স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার শিশুপুত্র শ্রীমান ভোলানাথ, শান্তিময়ীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হয়েন।

অত্যধিক আদরে শৈশব হইতেই ভোলানাথের নানা প্রকার চরিত্রদোষ ঘটে। কিন্তু মাতামহ স্নেহাধিক্যবশতঃ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই।

উত্তরোত্তর উচ্ছৃঙ্খল ভোলানাথের ঔদ্ধত্য এতটা বাড়িয়া উঠিল যে, একদিন সে মাধবগোবিন্দ বাবুর আশ্রিতা, দূর সম্পর্কীয়া এক বালিকার উপর অবৈধ অত্যাচার করিতেও দ্বিধাবোধ করিল না।

ফলে, পুণ্যপরায়ণ মাধবগোবিন্দ একমাত্র দৌহিত্রকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন।

বিতাড়িত ভোলানাথ এতদিন শান্তিময়ীর সহায়তায় এক খৃষ্টধর্ম্ম-মণ্ডলীর আশ্রয়ে যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস এবং পান ভোজনাদি পাশ্চাত্য বিদ্যার ব্যবহার অধ্যয়নে রত ছিল।

মাতামহের মৃত্যুর পর শান্তিময়ী ভগিনীনন্দনকে পুত্রের আসনে বসাইয়া পিতার বিষয়ের অর্দ্ধাংশ তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভোলানাথ জমিদারীর গুরুভার গ্রহণ করিয়া প্রবল প্রতাপে তাহা শাসন করিতে লাগিল।

ক্রমে নানাপ্রকার জাল দলিলাদির সাহায্যে সে বড় তরফের উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্ত জগদিন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বহু মামলা মোকদ্দমায় রত হয়। হালে জগদিন্দুর যথাসর্ব্বস্ব হস্তগত করিয়া সে মিয়াদগঞ্জের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইয়া বসিয়াছে।

এই সকল মোকদ্দমার ব্যাপারে শান্তিময়ী ভোলানাথের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলির মতই চালিতা হইয়াছেন।

স্বভাবতঃ প্রখর বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মশীলা শান্তিময়ীর একটা প্রবল দুর্ব্বলতা ছিল। তিনি ভোলানাথের অন্যায় কার্য্যগুলির বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদ করিতেন বটে, কিন্তু অবশেষে স্নেহান্ধতাবশতঃ তাহারই পক্ষাশ্রয় করিয়া বসিতেন।

তিনি জানিতেন যে ভোলানাথের পক্ষাশ্রয় করিয়া তিনি বিষম পাপে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছেন। তজ্জন্য তিনি নীরবে অশ্রুমোচন করিতেন, অনুতাপ করিতেন; কিন্তু যখন কোনও আবশ্যকীয় কাগজপত্র স্বাক্ষর করিবার জন্য ভোলানাথ তাঁহার কাছে উপস্থিত করিত, তখন সুমধুর ধর্ম্মোপদেশ প্রদানান্তর তিনি বিমুগ্ধচিত্তে ভোলানাথের অনুরোধ প্রতিপালন করিতেন।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার শান্তিময়ী অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হইতেন। এইভাবে আট নয় বৎসর ব্যাপি মামলা মোকদ্দমার পর সেইদিন ভোলানাথ জগদিন্দ্র বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত হস্তগত করিয়াছে।

* * * *

ভোলানাথ জমিদারীর ভার লইতে আসিয়া প্রচার করিয়াছিল যে, এতদিন সে বিলাতে থাকিয়া পুরাদস্তর সাহেব বনিয়া আসিয়াছে, এবং মাতৃভাষার সহিতও তাহার একটা বিষম ভ্রান্তি-বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে।

তৎসহধর্ম্মিণী শ্রীমতী পারুলকণাও একটি মিশনারী-সঙ্ঘে প্রতিপালিতা, অজ্ঞাত-কুলশীলা—বিদুষী রমণী। মাসীমার প্রভাবে কেহ প্রকাশ্যতঃ এতদুভয়ের বিরুদ্ধে সামাজিক অনুশাসন যন্ত্রটি প্রয়োগ করিতে পারে নাই বটে, তথাপি ভোলানাথ এবং পারুল

জমিদার বাড়ীর অন্দর-পশ্চাতে এক বিরাট বাঙ্গালা গৃহে স্বতন্ত্রভাবেই বাস করিয়া থাকে।

মাসীমার ইচ্ছা 'দুধের বাছারা দুইদিন ইচ্ছামত জীবনটা উপভোগ করিয়া লউক, তাহার পর সময় মত নিশ্চয় আপনা হইতেই তাহাদের ধর্ম্মে মতি হইবে; তখন, তিনি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবেন। যতদিন তিনি বাঁচিয়া আছেন, ততদিন স্বর্গীয় কর্ত্তার সংসারের আচার অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি হইবে না। তাহার পর, বয়সকালে ইহাদের ধর্ম্মজ্ঞান জন্মিবে—সে বিষয়ে শান্তিময়ীর সন্দেহ ছিল না।'

ভোলানাথ সাধারণতঃ 'মাষ্টার ভেল্‌বেটিন শ্যাটো' নামেই আত্মপরিচয় দিয়া থাকে। সে মাসীমা এবং সহধর্ম্মিণী ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে মাতৃভাষার উচ্চারণও করে না। আধা বাঙ্গালা, উর্দু, আরবী এবং ইংরাজী-মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব ভাষায় সে অপরাপর সকলের সহিত আলাপ ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহার বিশ্বাস, এইপ্রকার সাহেবী চালেই তাহার পদপ্রতিষ্ঠা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে।

ভোলানাথের একটিমাত্র পুত্র। তাহারই নাম শ্যামল। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই সে দিদিমার অঙ্কাশ্রয় করিয়া লালিত বর্দ্ধিত হইতেছে।

ভোলানাথের কুশিক্ষার বিষময় ফল শান্তিময়ী বেশ উপলব্ধি করিতেছেন। তাই, তিনি অতি সতর্কতা সহকারে শ্যামলের সুশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

শ্যামলের সঙ্গে তাহার পিতামাতার কোনও সম্বন্ধ নাই বলিলেও হয়। বিনা খরচায় অনাহারী 'আয়ার' হাতে পুত্রের প্রতিপালন-ভার সমর্পণ করিয়া ভোলানাথ-গৃহিণীও পরিপূর্ণ বিবিয়ানার মোহে ডুবিয়া রহিয়াছেন।

আজ প্রাতঃকালে, বড় তরফে দখলি পরওয়ানা জারী করিবার ভার তাহার সুযোগ্য শ্যালক 'মিঃ নেভা গেপেল স্যামেডারের' উপর অর্পণ করিয়া আকুল উৎকণ্ঠায় শ্যাটো এবং পারুল জনৈক বিশেষজ্ঞ খানসামার পরিচর্য্যায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

সাতদিনের বৃষ্টিতে মেদিনী এক আর্দ্র ম্লানরূপ ধারণ করিয়াছিল; সেই মলিনতা কৃষ্ণসাহেব-দম্পতির অন্তরে প্রবেশ করিয়া এক বিরাট কালিমা সৃজন করিয়াছে। বোতল বোতল তরল সুধা ঢালিয়া তাহারা সেই কালিমা ধৌত করিল।

শুভ্র আমেজে ক্রমে তাহাদের মেজাজ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিচিত্র হল কামরায় দুইজনে দুইজনের অঙ্গ জড়াইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ক্ষণপরে বড় তরফের অবস্থাটা স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বিরাট আনন্দে পারুল পুকুরধারে দৌড়াইয়া গেল।

সেই অবসরে শ্যাটো ভৃত্যের দ্বারা, দেওয়ান শ্রীযুক্ত অনন্তদেব-শর্ম্মাকে আহ্বান করিল। আভূমি বিস্তৃত সেলামান্তে একান্ত প্রভুভক্ত দেওয়ান মহাশয় কর্ত্তার মুখপঙ্কজের মধু আহরণে ব্রতী হইলেন।

"টুমি যাইটে পারে নাই কেন?" বলিয়া শ্যাটো—বেচারী দেওয়ানকে চমকাইয়া দিল।

বৃদ্ধ আজ্ঞাকারী ভৃত্য মাটির দিকে চাহিয়া কহিল, "আজ্ঞে সেইরূপ ত আদেশ ছিল না।"

বৃদ্ধের প্রত্যুত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া যথারীতি বিকৃত উচ্চারণে শ্যাটো বলিল, "তবু তোমারই যাওয়া উচিৎ ছিল। কে নাজিরের সঙ্গে গিয়াছে ?"

"আজ্ঞে স্বয়ং শ্যালাবাবুরই যাওয়ার কথা ছিল, তিনিই গিয়াছেন। কৃতী-ব্যক্তি, ধুরন্ধর লোক, মহাশয় মনুষ্য তিনি—"

"Shut up তোমার খোশামুদে রসনা! you dirty bitch!" বলিতে বলিতে শ্যাটো নিঃশেষিতগর্ভ কাচপাত্র টেবিলের উপর রাখিল।

"এতক্ষণ ফিরিয়া আসিতেছে না কেন? আমার ভাল লাগছে না। তোমরা কোন কাজেরই নও, খালি লম্বা বাক্যের কাঁদি!"

বিরক্তি-ব্যঞ্জক কুঞ্চিত ললাটে শ্যাটো বারেন্দাময় পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

এই ক্ষেত্রে কি করা বা বলা প্রয়োজন তদ্বিষয়ে গভীর গবেষণান্তে অনন্তদেব জোড়-করে নিবেদন করিল "আজ্ঞে অনুমতি হয়ত একবার দেখে আসি।"

"না, এতক্ষণ নিশ্চয় কেল্লা ফতে হইয়া গিয়াছে। আমার বিজয় পতাকা এতক্ষণ জগদার ভিটায় উড়ে ঘুঘু চরাচ্ছে।

বলিতে না বলিতেই নবগোপাল বিজয় দম্ভে সেইখানে উপস্থিত হইয়া বলিল—"

"আজ্ঞে বোনাইসাহেব! উড়ছে বলে উড়ছে! একেবারে ঝড়ের মুখে কাকের বাসার মত দাদা সাহেব—"

মূল্যবান কবিত্বের ফোয়ারামুখে বাধা দিয়া শ্যাটো বলিল,—"ওদের বাড়ীর বের কোরে দিয়ে এসেছ ত গ্যাবা গেপাল ?"

"সে কথা আর বলতে বোনাইসাহেব ? একেবারে মায়ে পোয়ে দাদাবাবু—বৌএ ঝিয়ে দাদা সাহেব—এক কাপড়ে !" বলিতে বলিতে নবগোপাল একটা বিকট পৈশাচিক হাসির রোলে গৃহতল কাঁপাইয়া তুলিল।

শ্যাটো সেই অস্বাভাবিক হাসির বীভৎস ঝঙ্কারে একটু শিহরিয়া উঠিল।

সহসা সংযত হইয়া সে বলিল,—"ছি ছি, ভদ্রলোকের মত হাসতেও শেখনি তোমরা ? যাক্—কোথায় গেল তারা ?"

"আজ্ঞে কোথায় যে গেল সেইটি ঠিক কিনা অর্থাৎ—" জড়িত, আড়ষ্ট কণ্ঠে—বলিতে বলিতে নবগোপাল মাথা চুলকাইতে লাগিল।

"কেন দেখে আস্তে পারলে না ?" শ্যাটোর জলদকঠোর হুঙ্কারে নববাবু প্রমাদ গণিলেন।

"দেখে আসিনি কি • বোনাইসাহেব—অর্থাৎ কোথায় আর যাবে ? খুব সম্ভবতঃ ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিণায় গিয়ে এতক্ষণ কেঙ্গলার দল আঁচল পেতে বসেছে—আর রাজ্যিশুদ্ধ লোকে—হাঃ হাঃ বোনাইসাহেব,—"

একটি একটি করিয়া চিবাইয়া ধীরে ধীরে সভয়ে সন্তর্পণে নবগোপাল কৃত্রিম হর্ষভরে এতগুলি কথা বলিল। তাহার গুম্ফশ্মশ্রুবিরল বদন কেন্দ্রে তাণ্ডব হাস্যের দীপ্ত তেজ জ্বলিয়া উঠিল।

"সে কি দাওয়ান ? ঠাকুরবাড়ীটা ডিক্রীর ভিতর নয় ?" বলিয়া শ্যাটো—মনের সমস্ত আক্রোশ, দীন অনন্তদেবের উপর ঢালিবার প্রচেষ্টা করিল।

"আজ্ঞে দেবোত্তর সম্পত্তি—" অনন্তদেব বিষম মনদুঃখে ম্রিয়মাণ রহিল।

তাহার মুখাবয়ব একটা নীরব ভাষায় যেন প্রচার করিতেছিল যে—'দেবোত্তর বলিয়াই ত ঠাকুর বাড়ীটি পর্য্যন্ত আয়ত্ব করা যায় নাই ! কিন্তু সেই ক্ষোভ এজন্মেও তাহার যাইবার নহে।'

"দেবোত্তর আবার কি ? কেন তখন সেইটি শুদ্ধ দলিলে লিখিয়ে নেও নাই ?" বলিয়া স্থিরকণ্ঠে শ্যাটো দাওয়ানের কৈফিয়ৎ তলপ করিল।

"আজ্ঞে গোলাম চিন্তার কশুর করে নাই। তবে কি না, কত পুরুষের দেবোত্তর সম্পত্তি—দলিলে লিখতে গেলে সকল কথাই ধরা পড়ে যেত। সাত চাল আগে ভেবে তবেইত গোলাম এক চাল চেলেছে। নৈলে আমার মনের দুঃখ—"

নেমকহালাল বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইল—দুইটি চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। সহানুভূতির দৃষ্টিতে একা নবগোপাল তাহাকে সান্ত্বনা দিল।

"কোন কাজেরই নও তোমরা ! যাক, এবার থেকে আবার সব কাগজপত্র তৈরী ক'রো। ঐ দেবোত্তর টেবোত্তর কিছুই আমি ছাড়তে চাই না।"

বলিতে বলিতে শ্যাটো বিরাট আরামে ইজিচেয়ার আশ্রয় করিল।

এমন সময় খল খল হাসির উৎসে ভাসিতে ভাসিতে চঞ্চল-চরণ, শ্লথবসনা শ্রীমতী পারুলকনা সেইখানে প্রবেশ করিলেন। আসিয়াই তিনি শ্যাটোর অঙ্গে শ্রীঅঙ্গ ঢালিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, অমনি শ্যাটো তাহাকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করিল।

শ্রীমতীর আদেশে শ্যাটো অগত্যা অনন্তদেব ও নবগোপালকে বিদায় করিল। তাহারা উভয়ে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে শ্যাটো বলিল,—

"ছি ছি এক ফোঁটা মুখে পড়লেই তোমার দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না! ওদের সামনে অমন কোরে আমার গায়ে পড়ছিলে—লজ্জা করল না?"

"Pooh! ঐ বুড়ো বাঁদরটাকে আবার লজ্জা কি? বেরাল কুকুরকে মানুষে লজ্জা করবে? আর নব?—সে ত ছেলে মানুষ!"

জড়িতকণ্ঠে এই কয়টি কথা বলিতে বলিতে পারুল শ্যাটোর অঙ্গে ঢলিয়া পড়িল। তাহার বুকে বুক, অধরে অধর, নয়নে নয়ন—মিলাইল।

শ্যাটোর গলা জড়াইয়া ধরিয়া সুরাবিহ্বলা আদরিণী আবার বলিল,—"ওটাকে তাড়িয়ে দাও—বাঁদরটাকে আমার আদৌ পছন্দ হয় না।"

"By jove! বল কি প্রেয়সী! একটা আস্ত জুয়েল! ওকে তাড়িয়ে দেব? আট বছরে—তিন পুরুষের খাতাপত্তর, দলিল দাস্তাবেজ—বেমালুম বদল করতে পারে—এই বুড়ো বাঁদরটি ছাড়া, আর একটিত তেমন জানোয়ার আমার চক্ষে পড়লো না। বিয়াল্লিশটা

সাক্ষীকে পায়রা পড়িয়ে আদালতে দাঁড় করালে—আহা—নির্জ্জলা মিথ্যাসুরের একটা একটানা নিখুঁত কন্‌সার্ট বাজিয়ে গেল। নিজে হাবা বোকার মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় এমন সাক্ষ্য দিলে, —উকীল কৌঁশলী ত ঘোল খেয়ে গেলোই—আবার জজ সাহেব লিখলে,—'বোকা, কিন্তু নিরেট সত্যবাদী'! Bravo! Long live my বুড় বাস্তু ঘুঘু! তাকে তাড়িয়ে দোব? তোমার বড্ড নেশা হ'য়েছে পারুল—না?" বলিয়া শ্রীমতীর অধর সুধা পানে শ্যাটো বিস্ময়ের লাঘব করিল।

উভয়ের প্রাণ তখন বিপুল আনন্দে ভরপূর! নিমিষে বোতল খালি হইয়া গেল। অন্য বোতলের সিপি খুলিয়া বেয়ারা টেবিলে রাখিল। পরস্বাপহারী প্রেতদম্পতির উলঙ্গ বীভৎস নৃত্য দর্শনে বেচারা বেয়ারা পর্য্যন্ত হস্তে মুখ ঢাকিল।

এমন সময় "হ্যাঁ বাবা—ওদের কেন তাড়িয়ে দিলে বাবা—কাকীমা'রা ঠাকুরবাড়ী কেন গেল বাবা?"

বলিতে বলিতে বিষাদমলিন নতমুখে শ্যামল সেখানে উপস্থিত হইল। হঠাৎ পূতচিত্ত বালক, পিতামাতার অবস্থা দেখিয়া তখনি আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইবার প্রয়াস করিল। অমনি পারুল অর্দ্ধনগ্ন, শিথিল দেহবল্লরী সঞ্চালনে কষ্টে বালকের হাত ধরিয়া ফেলিল।

"কি বলছ ডার্লিং?"

বলিয়া পারুল সুরা-সৌরভ-পূরিত অধরবিম্ব বালকের গণ্ডে স্থাপন করিল।

কষ্টে আত্মরক্ষা করিয়া বালক আবার বলিল,—

"ওদের তাড়িয়ে কেন দিলে মা—ওরা ঠাকুর বাড়ী গেল কেন ?"

পৈশাচিক হাস্যে বাতাস কাঁপাইয়া শ্যাটোভামিনী বলিল,—

"ঠাকুর বাড়ী কেন গেল ? কাঠ কুড়োতে, বাট্‌না বাট্‌তে—আঙ্গিনা ঝাঁট্‌দিতে আর শেল কুকুরের অধম হ'য়ে দুবেলা দুমুঠো মুখে গুঁজতে ! বুঝলে my darling !"

বলিয়া পারুল বালকের মুখে সুধার পাত্র স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিল। ভয়ে শ্যামল মাতার দুর্ব্বল বাহু-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দূরে সরিয়া গেল।

"না মা—আমায় ছাড়, বড় দুর্গন্ধ ! ও খেলে মরে যাব—তোমার পায়ে পড়ি মা।"

বলিয়া বালক বিষম আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিল।

"Oh you naughty old fool ?" বলিতে বলিতে পাত্রস্থ মধুর সরবৎ উদরস্থ করতঃ শ্যাটোর উদ্দেশে পারুল পুনরায় বলিতে লাগিল,—

"আমার এসব ভাল লাগে না। ছেলেটাকে আদর দিয়ে কেমন বকিয়ে দিয়েছে ছ্যাখ ! বাপ মায়ের কথাও শুনবে না ? ছি ! ছি !"

ধীরে অাঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে শান্তিময়ী সেখানে আসিয়া বলিলেন,—

"ভুলো, যা শুন্‌ছি তাকি সত্য ?"

শ্যাটোর তখন প্রবল নেশার অবস্থা। শান্তিময়ীর কথা তাহার কাণেই গেল না।

"যাও—ঘ্যান ঘ্যান ভাল লাগে না এখন।" বলিয়া সে ইঙ্গিতে

শ্যামলকে কাছে ডাকিল। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া শ্যামল ঠাকুরমার জানুপ্রদেশ জড়াইয়া ধরিল।

"কি হয়েছেরে শ্যামল?"

সস্নেহে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া শান্তিময়ী শ্যামলের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। ঠাকুরমার বুকে মুখ লুকাইয়া শ্যামল আস্তে সন্তর্পণে বলিল,—

"মা আমায় কি সব খেতে বলে ঠাকু'মা।"

ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে প্রজ্ঞাময়ী ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। "তোদের সঙ্গে এখন কথা কওয়াই বৃথা। তবু জেনে রাখ ভুলো, আমাকে লুকিয়ে যা করেছিস, তার চেয়ে মহাপাপ আর কিছুই হয় না। আর বৌমা! তুমি এই দুধের ছেলের মুখে নাকি ঐ বিষ ঢেলে দিতে চেয়ে ছিলে?"

"একশ' বার দোব! আমার ছেলে, আমি—"

বাধা দিয়া শান্তিময়ী বলিলেন—"বিষের নেশায় পাগল হয়েছ তোমরা, তাই মাপ করলেম। তোমার ছেলে,—নয়? শুধু বিয়ুলেই ছেলে হয় না বৌ! আঁতুড়ঘর থেকে আমার কোলে শুয়ে, আমার বুকের রক্ত চুষে, আমারই আদরযত্নে এত বড়টি হয়েছে—সে তোমার ছেলে—নয়?" প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই আহত-মর্য্যাদা মহীয়সী প্রস্থান করিলেন।

বীভৎস উল্লাসে উন্মত্ত দম্পতি সুরাস্রোতে ভাসিয়া সমস্ত দিন-রাত্রি উদ্দাম আনন্দে অতিবাহিত করিল।

---

(৩)

ঠাকুর বাড়ীতে আসিয়া সত্যভামা দেবী মানসিক দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। ভ্রাতা শ্রীধরের সহিত দিবারাত্রি নানাবিধ আলাপে তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জগদিন্দু সামান্য একটু চেষ্টা করিলে স্বর্গগত কর্ত্তার জমিদারী—যায় বাস্তভিটা পর্য্যন্ত এমন করিয়া শত্রুর হস্তগত হইত না।

তিনি নানা কৌশলে—আদেশ, অনুরোধ, উপরোধ এমন কি তিরস্কার করিয়াও জগদিন্দুকে পুনরায় মোকদ্দমায় লিপ্ত করিতে পারেন নাই।

এখনও ঠাকুর বাড়ীর বাৎসরিক আয় যাহা আছে তাহাতে এই ক্ষুদ্র পরিবারের অক্লেশে চলিয়া যাইতে পারে। উপরন্তু, সত্যভামার নিজের কিছু নগদ অর্থ এবং তাহার ও বধূ অনুশীলার অলঙ্কারাদিতে দুই দশ হাজার টাকা রহিয়াছে। ইহাদ্বারা অনায়াসে আবার একটা মোকদ্দমা রুজু করিয়া লুপ্ত জমিদারীর পুনরুদ্ধার করা যায়।

এই অবস্থায় সামান্য বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন যে কেহই আবার নূতন মামলা পত্তন করিতে দ্বিধা বোধ করিত না। কিন্তু এমনি সত্যভামা দেবীর দগ্ধ অদৃষ্ট, জগদিন্দু তাঁহার কথা কাণেই তুলিল না। অভিমানে সত্যভামা দুইদিন জলবিন্দু গ্রহণ করেন নাই।

তপ্ত নিদাঘমধ্যাহ্নের প্রখর মার্ত্তণ্ডতাপ, শূন্য উদরজ্বালা,

আর হৃদয়ের পরিপূর্ণ দুঃখভার জুড়াইতে মাতা, ঠাকুর বাটী-প্রাঙ্গণস্থিত—বট, অশ্বথ, অশোক, বেল ও আমলকী বৃক্ষ-রচিত পঞ্চবটী ছায়ায় বসিয়া মালা ফিরাইতেছেন।

যেই মিরাদগঞ্জে একদিন সত্যভামা দেবীর স্বামী, শ্বশুর প্রভৃতি প্রবল পরাক্রমে 'রাজত্ব' করিয়া গিয়াছেন; যেই গ্রামের মধ্যে তাঁহার পদমর্য্যাদা একদিন সর্ব্বোচ্চ বলিয়া গণ্য হইত, হঠাৎ সেই গ্রামেই আবার দীন অবস্থায় পূর্ব্বপুরুষ-স্থাপিত বিগ্রহসেবার উপস্বত্বে জীবনধারণ করা সত্যভামার পক্ষে দুঃসহ মর্ম্ম-পীড়ার ব্যাপার, একথা বলাই বাহুল্য।

ইতিমধ্যে দলে দলে ভদ্রাভদ্র প্রজাবর্গ আসিয়া জগদিন্দুকে নজরাণা দিয়া গিয়াছে। তাহারা অর্থ সাহায্যের ভরসা দিয়া সকলে মিলিয়া আবার জগদিন্দুকে মোকদ্দমা করিবার জন্য অনুরোধও করিয়াছে; কিন্তু সমস্তই অরণ্যে রোদনের মত নিস্ফল—জগদিন্দুর সংকল্পের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

জগদিন্দু শিক্ষিত, সদ্‌বংশজাত, চরিত্রবান যুবক। তাঁহার সমবেদনা, সুবিচারশক্তি এবং প্রাণঢালা আত্মত্যাগের জন্য সেই প্রদেশের আবালবৃদ্ধ সকলেই তাঁহাকে যথাযোগ্য স্নেহ, শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করিয়া থাকে। সেই জগদিন্দু আজ কোন্ উচ্চতর আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায়, কোন্ প্রগাঢ় মনোবেদনায় সর্ব্বত্যাগী বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছে—কেহ সে কথা ভাবিল না বা বুঝিল না।

এক মুহূর্ত্তের জন্যও জগদিন্দুর অবসর নাই। বিরাট পল্লী-কর্ম্মকেন্দ্রে

প্রাতঃকাল অবধি বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, গৃহে গৃহে ঘুরিয়া দীনবেশে তরুণ বৈরাগী আর্ত্তের সান্ত্বনা, রোগীর সেবা, দরিদ্রের সাহায্য করিয়া বেড়ায়।

বিকালে আবার গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ঠাকুরবাটী-প্রাঙ্গণে-পঞ্চবটী-বিচ্ছায়ে শ্যামল দুর্ব্বাদল গালিচা-মণ্ডিত ভূমিতলে, চন্দ্রতারকামালা-খচিত বিশাল চন্দ্রাতপ-নিম্নে নানাগ্রামের শত শত লোক জড় হইয়া—পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক বা বৈষয়িক সর্ব্বপ্রকার মনোমালিন্যের অবসান করিয়া যায়।

অনুশীলা প্রাতঃকালে মাতার পূজাহ্নিকের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছেন—কিন্তু সত্যভামার ক্রোধ বা অভিমানের লাঘব হয় নাই। দয়িতা শিশুসুলভ আবদার-অনুনয়ে 'ঠাকু'মার' কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছে, কোন ফলই হয় নাই।

ভোর না হইতে বালিকা ঠাকুর বাড়ীর বাগান হইতে নানাবিধ ফুল তুলিয়া—মালা গাঁথিয়া—এক সাজি ফুল ঠাকুর বাড়ী পাঠাইয়া অপর সাজি 'ঠাকুমার' পূজার জন্য পৃথক করিয়া রাখে। দুই দিন সেই ফুল সাজিসুদ্ধ শুকাইয়া রহিয়াছে।

অভিমানে, দুঃখে বালিকা একদিন 'আড়ি ধরিয়া' ঠাকুরমার সঙ্গে কথাই কহে নাই। অতি দুঃখে প্রগাঢ় অভিমানে আজি আবার বালিকা সত্যভামার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়াছে,তথাপি 'ঠাকু'মার' রাগ পড়ে নাই।

তাই দয়িতা কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরমার শয়নকক্ষে ঠাকুরমার পূজোপচার—কুসুম-সম্ভার আগলাইয়া ধূলীশয্যায় ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

ঘুমের মধ্যেও কঠোর মর্ম্মপীড়ায় মাঝে মাঝে এক একটা পাঁজরা-কাঁপান দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বালিকার চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

দেবালয়ের ভোগ-আরতি হইয়া গিয়াছে। পূজারিগণ অন্দর বাড়ীর জন্য প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়া আহারান্তে বিশ্রামসুখে মগ্ন হইয়াছে; সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ। কেবল সত্যভামা একাকী পঞ্চবটীনিম্নে মালা জপিতে জপিতে ইষ্ট-মন্ত্র ভুলিয়া, বিষম দুশ্চিন্তায় অশ্রুমোচন করিতেছেন।

অন্দরে অনুশীলার প্রাণেও স্বস্তি নাই—জননীরূপিণী শ্বশ্রূঠাকুরাণী গভীর মনোবেদনায় দুই দিন ধরিয়া অভুক্তা রহিয়াছেন। সমস্তদিন পরে কাল রাত্রিতে জগদিন্দু ও অনুশীলা দুই মুষ্টি শুষ্ক অন্ন মুখে তুলিয়াছিল; আজ এখনও জগদিন্দু গৃহে ফিরে নাই, অনুশীলাও অভুক্তা রহিয়াছ।

অনুশীলা কোন মতেই মনঃস্থির করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে সত্যভামার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। নীরবে অশ্রুমোচন করিয়া সাধ্বী, শাশুড়ীর পদধূলী মাথায় লইয়া বলিল,—

"চল মা। এমন কোরে না খেয়ে থেকে আমাদের অকল্যাণ কোরো না। মেয়েটাও না খেয়ে পূজার ঘরেই এতবেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে রয়েছে।"

সত্যভামা প্রথমে কোনও কথাই বলিলেন না। অনেক সাধ্যসাধনার পর তাঁহার মুখে কথা বাহির হইল বটে, কিন্তু অনুশীলা ব্যতীত বাঙ্গালার দ্বিতীয় কোনও কুলবধূ শাশুড়ীর সেই সকল

কটু, কর্কশ, নির্জ্জলা মিথ্যাপবাদ এবং লাঞ্ছনাবাক্যগুলি হাসিমুখে হজম করিতে পারিত কিনা জানিনা।

সত্যভামা দীর্ঘ মৌনব্রত-ভঙ্গে প্রথমতঃ অকর্ম্মণ্য পুত্রের দুর্ব্যবহার, এবং আত্মমর্যাদাজ্ঞানের অভাব সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বিলাপ বক্তৃতা করিলেন। পরে অলক্ষণে, স্কুলপড়া, বিদুষীবধূবরে আনিবার ফলে কেমন করিয়া তাঁহার লক্ষ্মীর সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে; কেমন করিয়া অলক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি, রঙ্গপরিহাসপরায়ণা, রূপসী, ডাকিনী অনুশীলা, মাতার স্নেহ ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া তাঁহার সর্ব্বগুণের আধার পুত্ররত্নকে বিপথে চালিত করিতেছে; কেমন করিয়া স্ত্রৈণ জগদিন্দু, পত্নির সহিত একদিনের বিচ্ছেদ ভাবনায় সদরে যাইতে কুণ্ঠিত হইতেছে, ইত্যাদি যাবতীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া একপক্ষদুষ্ট বাক্যপ্রবাহেমগ্ন রহিলেন।

অনুশীলা কোনও প্রতিবাদ করিল না। তাই গুছির অভাবে বাক্যরজ্জুবচনায় অসমর্থ হইয়া অগত্যা সত্যভামা নীরব হইলেন।

হাস্যময়ী অনুশীলা বিনয়নম্রভাবে সকল অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল—সত্যভামার মার্জ্জনাভিক্ষা করিল।

"মা, শত অপরাধ করেছি আমরা। তুমি যে মা! মাহারা অলক্ষণে মেয়েকে যে তুমি মেয়ের মতই এতদিন প্রতিপালন করেছ মা! আমাদের অপরাধ মাপ করো।"

বলিয়া সরলতাময়ী সত্যভামার পদপ্রান্তে অশ্রুবৃষ্টি করিতে লাগিল।

এমন সময় শ্রীধর আহারান্তে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিয়া দক্ষিণ-হস্তে বাজনী ও পান, বাম হস্তে হুকা এবং স্কন্ধে আর্দ্র গামছা

লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। ঘোমটা টানিয়া ম্লানমুখী অনুশীলা দূরে সরিয়া বসিল।

দোসর পাইয়া সত্যভামা দেবীর কথার তৃষ্ণা আবার জাগিয়া উঠিল।

"ছিছ্, তুইও আমার কথা শুনবি নি? এই গ্রামে আমি সকলের কাছে হেয় হয়ে থাকতে পারব না। আমাকে, বাবা বিশ্বেশ্বরের পায়ের তলায় রেখে আয় ভাই!" বলিতে বলিতে মাতা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

শ্রীধর সুযোগ পাইয়া বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আচ্ছা বৌমা! দিদির উপর এই অত্যাচার—এটা কি ভাল হচ্ছে?"

অনুশীলা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে ত কখনও জ্ঞানতঃ কাহারও প্রতি কোনও অত্যাচার করে নাই—তবে এ কথার অর্থ কি!

ভাবে বধূর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া শ্রীধর বলিল—

"তুমি ত বাছা বরগেরস্থের মেয়ে, তুমি বুঝবে না। যেই গ্রামে দিদি একদিন সকলের উপর প্রভুত্ব ক'রে বাস কচ্ছিলেন, সেই গ্রামেই আবার দীনভাবে বাস করা যায় কি? তাই বলছিলেম, বৃদ্ধবয়সে এই অত্যাচার একে তোমরা কেন কচ্ছ?"

ভাবটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনুশীলা আশ্বস্ত হইল। আবার তখনই দারুণ দুঃখে অনুচ্চস্বরে বলিল,—"মাকে ইচ্ছা করে কি আমরা কোন কষ্ট দিচ্ছি মামাবাবু?"

সুযোগের অবহেলা করিবার পাত্র শ্রীধর নহেন। তিনি তাই বলিয়া ফেলিলেন,—

"তা ছাড়া আর কি বলব বল? ইচ্ছা করলেই যখন আবার পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়ে পাওয়া যায়—অন্ততঃ দিদির মুখ চেয়েও কি তোমাদের, তা করা উচিত নয়। না করলে অবশ্যই সেটা ইচ্ছাকৃত অত্যাচারই বলা যেতে পারে।"

দারুণ অভিমান এবং প্রগাঢ় মর্ম্মব্যথায় অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অনুশীলা অর্দ্ধ অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—

"ওঁকে ভাল কোরে বলুন না কেন? আমার ত তাঁর কথার উপর কথা বলা সাজে না মামাবাবু! কিন্তু মা দুদিন উপবাসী, মাকে বুঝিয়ে বলুন—এতে যে আমাদের বড় অকল্যাণ হয়।"

সত্যভামা আর নীরব থাকিতে পারিলেন না।

"আহা কথার ভঙ্গী দেখ! ছেলেটাকে ভিখারীর মত পথে বসিয়ে আবার পোড়া মুখে কল্যাণ অকল্যাণের কথা! মুখে আগুন! আর আমার কাছে কারু বক্তৃতা কর্ত্তে হবে না। আমার ইচ্ছা হ'লে খাব, নয় খাব না, তাতে কারু ভাবনা কর্ত্তে হবে না। রাজার রাজ্যি লুটিয়ে দিতে দরদ হলো না—আজ কিনা মায়ের দুঃখে মায়াকান্না কাঁদতে এসেছেন!"

অনুশীলার সদাস্নিগ্ধ প্রশান্ত হৃদয়ে মায়ের কথার তীক্ষ্ণ বাণগুলি একটু আঁচড় কাটিতেও সমর্থ হইল না। সে আশৈশব বাক্‌সংযম অভ্যাস করিয়াছে। মায়ের তিরস্কার সে আজীবন আশীর্ব্বাদ বলিয়াই বরণ করিয়া লইয়াছে; বিশেষতঃ স্বকীয় আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন—সংস্কার, শিক্ষা এবং চিরাচরিত আচার ব্যবহার-জনিত ধারণায় বর্ত্তমান দৈন্যের অবস্থা যে জমিদার-গৃহিণী, জমিদার-

মাতা সত্যভামার পক্ষে দারুণ ক্লেশদায়ক, তাহা অনুশীলা বুঝিতে পারিত।

এমন সময় ভজহরি,—

মাটির পুতুল কে বলে রে,
চিন্ময়ী তুই মৃণ্ময়ী মা।

গাহিতে গাহিতে শ্যামলের সঙ্গে সেইখানে উপস্থিত হইল।

আজ দুই দিন দয়িতার সঙ্গে শ্যামল খেলা করিতে পায় নাই। তাই বালক অভিমান ত্যাগ করিয়া দয়িতার খোঁজে আসিয়াছে।

অগত্যা অনুশীলা অন্দরে প্রস্থান করিল। এক লম্ফে বালক কাকীমার কোলে উঠিয়াই তাঁহার মলিনমুখ দেখিয়া বিমর্ষ হইল।

সত্যভামা মনের দুঃখে অনেক আক্ষেপ করিয়া, অবশেষে কাশীধাম যাত্রাই সমীচীন বলিয়া স্থির করিলেন। শ্রীধর অগত্যা আবার একটা বিরাট মোকদ্দমার বিপুল মাদকতার আশা ত্যাগ করিয়া, ভগ্নির সহযাত্রী হইতে সম্মত হইল।

ক্ষণকাল এই সকল কথায় অতিবাহিত হইলে ডাক হরকরা জগদিন্দুর নামীয় একখানা রেজেষ্ট্রী পত্র শ্রীধর বাবুর হাতে দিয়া গেল।

পত্র পড়িয়া হর্ষবিষাদের বিজলী-ছায়ালোক-সম্পাতে—শ্রীধরের বদনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অধৈর্য্য উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া ভ্রাতা ভগ্নী অন্যমনে ভজহরির সুমধুর সঙ্গীততরঙ্গে ভাসিতে লাগিল।

প্রায় দুই ঘটিকার সময় জগদিন্দু ক্লান্ত অবসন্ন দেহে গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বিমল উৎসাহে পত্রখানা তাঁহার হাতে দিয়া শ্রীধর বলিল,—

"আর অমত করোনা বাবাজী! এত বড় উকিল রসিক বাবু, তিনি লিখেছেন ছাখ, মিথ্যা 'রিটার্ণ' দিয়ে ডিক্রীজারিতে দখল নিয়েছে বলে, এবার সদরে গিয়ে একটা দরখাস্ত আর 'এফিট-ওপীঠ' করলেই বেটা কেলফিরিঙ্গীকে হাতকড়ি দে পুলিপোলাও চালান ক'রে দেবে।"

বিরাট আনন্দের হাসি-হিল্লোল অন্তর ছাপিয়া শ্রীধরের শ্রীমুখ প্লাবিত করিয়া দিল। পত্র পাঠান্তে অনেকক্ষণ জগদিন্দু নীরব রহিল।

তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে ভাবিয়া শ্রীধর মহাহর্ষে-বলিল,—

"আর দেরি করো না বাবাজী,—আজকের মেলেই যেতে হবে ত'।"

ধীরে স্পষ্ট-স্বরে জগদিন্দু বলিল,—

"মামা না, আর আমায় প্রলোভন দেখিও না। শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছি, আর সেই শৃঙ্খলে বাঁধতে চেওনা আমায়।"

বিস্ময়বিমূঢ়া সত্যভামা বলিলেন, "সে কিরে জগত? উকিলবাবু লিখেছেন, ওদের পুলিপোলাও চালান কোরে দেবেন—তবু তোর ঘুম ভাঙ্গল না?"

"না মা, এই উকিল জাতটাকে আমি বেশ ভাল করেই চিনেছি। সরল প্রাণ বিষয়লিপ্সুদের অনায়াসে পাহাড়ে তুলে আবার পাষাণে আছড়ে মারতে একটু দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করে না এরা। ভিটায় ঘুঘু চরিয়ে আবার অমনি আকাশের চাঁদ হাতে তুলে দিতে এদের মত কেউ নাই। এই জাতটাকে খুব ভাল কোরেই চিনেছি মা!"

বলিয়া জগদিন্দু অন্দর-অভিমুখে যাইতেছিলেন।

ভজহরি অমনি বলিয়া উঠিল "সে কিরে জগদা ? সস্তায় এমন কিস্তিটা হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলি ?"

হাসিতে হাসিতে জগদিন্দু বলিল "তাইত দিলেম দাদা ! ভজা আর জগদা যুগল ইয়ার যে এক গোয়ালে ঘাস খায়রে।"

বাধা দিয়া অধৈর্য্য সত্যভামা বলিলেন,—

"ঝাখ, আমার এই শেষ কথা। আমার কথা তুই শুনবি নি ?"

স্তম্ভিতে জগদিন্দু ভাবিল, "মায়ের কথা শুনবো না ? না, এ'ত মায়ের কথা নয় ! ভ্রাতার বক্ষরক্তের তৃষ্ণায় ভাইয়ের হাতে মা কখনও ছুরি তুলে দেয় না—এ মাতুলের কথা; মা সন্তানের মঙ্গল-কামনায় বুক ছিঁড়ে বক্ষের নিধিকে নিরাপদ নিরালায় রেখে আসে, আর মামা—সদ্যজাত শিশুকে পাথরে আছড়ে মারে।"

তাহাকে নীরব দেখিয়া ধৈর্যহীনা সত্যভামা বলিলেন,—"আমার কথার উত্তর চাই জগত।"

ভূমিগাত্রে নতদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া জগত বলিল,—"আর আমি কোন ঝঞ্ঝাটে যাব না মা।"

বিষম ক্রোধে উন্মত্ত জননী নানা বিভীষিকা-প্রসূ জ্বালাময় বাক্যে পুত্রকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। নীরবে জগত সকল কথা শুনিয়া গেল, একটি কথারও প্রত্যুত্তর করিল না।

তাহাতে অধিকতর ব্যথিতা হইয়া সত্যভামা বলিলেন,—

"জগত, তা হ'লে আমি কি বুঝব যে তুই সদরে যাবি না ?"

নম্র অথচ স্থিরকণ্ঠে জগদিন্দু বলিল,—"না মা, আর আমি আদালতের আবর্জ্জনার স্পর্শে যাবনা।"

"বেশ, তা হ'লে আমি চল্লেম জগত। আর তোর মত কুল-কলঙ্ক পুত্রের আশ্রয়ে এক তিলও থাকব না।" বলিয়া মাতা গাত্রোত্থান করিলেন।

"কোথায় যাবে মা ?"

"আমি আজই কাশী চল্লেম।"

"বেশ মা, তাই ভাল। তোমার ইচ্ছা হ'লে আমিই তোমায় শ্রীবিশ্বেশ্বরের কাছে পৌছে দিয়ে আসি মা।"

"কোন কাজ নেই। তোর মুখ দেখলেও পাপ হয়—তুই আমার পুত্র নস্! তুই—

ক্রোধোন্মত্তা মাতা বিষয়বিভ্রান্তির মোহে পুত্রকে আরও কটূক্তি করিতে যাইতেছিলেন। সহাস্যে জগদিন্দু বাধা দিয়া বলিল,—

"অমন কথা বলো না মা! আমি তোমারই পুত্র! যাও মা—শ্রীভগবান তোমার প্রাণে শান্তি বিধান করবেন। তোমার আজন্মার্জ্জিত সংস্কার অভিমান-ব্যথা আমি বুঝতে পারি মা। কিন্তু প্রতীকারের পন্থা নাই। তবু মা, আবার একদিন এসো—তোমার অযোগ্য সন্তান যেদিন মাতৃমন্ত্রের সাধনা কল্লে এই পল্লীপীঠ বুকের রক্তে ধুয়ে, আবার আহ্বান করবে তোমায়, সেদিন এসো মা।"

বলিতে বলিতে ভাববিহ্বল নবীন সন্ন্যাসী সেই সুপবিত্র বটচ্ছায়ায় পূত মাতৃপদধূলি মাথায় তুলিয়া লইল।

শ্রীধরের হাত ধরিয়া সত্যভামা অন্দর মধ্যে প্রস্থান করিলেন। তাড়াতাড়ি নিজের সমস্ত বস্ত্রালঙ্কার, অর্থাদি বাঁধিয়া লইয়া ভ্রাতার সহিত সত্যভামা কাশীধাম যাত্রা করিলেন।

অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া ভজহরি জগদিন্দুর কাছে আসিয়া বলিল, "সাবাস ভাই—কিন্তু পারবি ত ?"

গভীর মর্ম্মবেদনা চাপিয়া রাখিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া আর্দ্র, রুদ্ধকণ্ঠে জগদিন্দু বলিল,—

"কি জানি ভাই, হৃদয় স্বভাবতঃ দুর্ব্বল—কর্ম্ম বিরাট। তবে চেষ্টা করে দেখি।"

"তুই পারবি জগদা। আমি দেখ্‌ছি—সত্য সাধকের জ্যোতিঃ তোর মুখে ফুটে উঠেছে !"

বলিতে বলিতে বিমল আনন্দে ভজহরি—

ভাবসাগরে নবীন তরী—প্রেমের নেয়ে ঐ বেয়ে যায়।

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

দয়িতা আর শ্যামল অধোমুখে সেইখানে আসিয়া, দুইজনে জগদিন্দুর দুইখানি হাত ধরিল।

অশ্রুবৃষ্টি-স্নাত কচি মুখখানা পিতার বক্ষে লুকাইয়া দয়িতা বলিল,—"ঠাকুমাকে যেতে দিও না বাবা !"

শিশুহৃদয়ের অন্ধ আগ্রহবাণী জগদিন্দুর প্রাণে নূতন করিয়া তুফান তুলিল। সে ভাবিল,—

'যাক, সকল সঙ্কল্প চূর্ণ হয়ে যাক, তবু সংসার উদ্যানের এই সুধাবৃক্ষের মূলোচ্ছেদ কর্ত্তে পারব না।"

এই প্রকার প্রবল দ্বন্দ্বে, জয়পরাজয়ের ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে পড়িয়া জগদিন্দুর পবিত্র আদর্শ প্রায় ভাঙ্গিয়া গেল।

"মা—যাঁর দেহাভ্যন্তরে এই জরা, মরণ, আধি, ব্যাধি-মন্দির

মাংসপিণ্ড—প্রথম রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছিল ; যাঁর ধমনীর রক্তধারার সুধাপ্লাবনে এই অহমিকালিপ্ত দেহে প্রথম অমৃতবিন্দু সিঞ্চিত হইয়াছিল ; মা—যাঁর স্নিগ্ধ, অভয়ক্রোড়ে অজ্ঞান, ক্ষীণ শিশুও সংসারের শত বিভীষিকার ভয় পরিহার করে—যাঁর বক্ষ শোণিতধারা শিশুমুখে ভগবান ক্ষীরামৃত-রূপে ঢালিয়া দেন, যাঁর নিঃস্বার্থ স্নেহ, ভালবাসা, আত্মত্যাগ কোন প্রতিদান চায় না—সেই মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়েছি ! না, তা হবে না !”

ভাবিতে ভাবিতে মাতৃভক্ত সাধকের মন একাক্ষর মাতৃমন্ত্রের অমৃত মদিরায় ভরিয়া উঠিল।

বিষম সন্দেহে তাঁহার সমস্ত সত্তা কাঁপিয়া উঠিল। ‘এযে মা ! চিন্তাময়ী, ধারণাময়ী, প্রত্যক্ষীভূতা, জগদীশ্বরী জননী। আর, অপর দিকে—বিরাট কল্পনাময়ী, ভাবময়ী, প্রেরণাময়ী, জগদ্ধাত্রী-রূপিণী জন্মভূমি। একদিকে জাগরণ—অন্য দিকে স্বপ্ন। একদিকে জড় প্রত্যক্ষীভূতা দেবী—অপরদিকে সূক্ষ্ম মানসপ্রতিমা। একদিকে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ; অপরদিকে অতীন্দ্রিয়, পরোক্ষ জ্ঞান।’

ভাবনা-বিহ্বল, পথহারা জগদিন্দু আপন মনে ভাবনা রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। দয়িতা পিতার এই উদ্‌ভ্রান্ত ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পায়ে আছড়াইয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—“ঠাকুমাকে যেতে দিও না বাবা !”

সহসা শিশুর ক্রন্দনে জগদিন্দুর জ্ঞান সঞ্চার হইল। শিশু যুগলের কোমল দেহবল্লরী বক্ষে ধরিয়া তাহাদের মস্তকে সান্ত্বনার হাত বুলাইতে বুলাইতে সে বিরাট দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

অচিরে জগদিন্দু নানাপ্রকার মধুরবাক্যে শ্যামল এবং দয়িতাকে শান্ত করিল। প্রবুদ্ধ বালক বালিকা মধুর নীরব আপ্যায়নে, নিভাঁজ অমৃতময় বাক্যচ্ছটায়—জগদিন্দুকে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভুলাইয়া রাখিল। অচিরে দূরে নাটমন্দির মধ্যে তাহারা খেলায় মগ্ন হইল।

এমন সময় ধীরে ধীরে অনুশীলা আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। বিষম দ্বন্দ্বতুফানে তাঁহারও হৃদয় মথিত হইয়াছে। ইতিকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া সাধ্বী, স্বামীসকাশে আগমন করিয়াছে। তাঁহার চক্ষু বহিয়া অশ্রুমালা গড়াইয়া পড়িতেছিল।

"মাকে বারণ করলে না?" বলিয়া স্বামী-সোহাগিনী আঁচলে চক্ষু মুছিল।

"বারণ করে কি হবে অনু? যেই গ্রামে একদিন মা সর্ব্বময়ী কর্ত্তৃরূপে বাস কর্চ্ছিলেন সেই গ্রামে এমন দীনভাবে বাস করতে কি তিনি পারবেন? ভাবছি—এস্থলে কি করব! আবার বিষয়ের মোহে গা ভাসিয়ে দেব—না যেই সঙ্কল্প করে ঘর থেকে বেরিয়েছি, তাই নিয়ে এগিয়ে যাব।"

জগদিন্দু আবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

"মাকে ছেড়ে কখনও থাকিনি। তাঁকে ছেড়ে সংসারে কি কোরে থাকব? অথচ বুঝতে পাচ্ছি, এমন কোরে তিনি—"

বলিতে বলিতে কি ভাবিয়া অনুশীলা নীরব হইল। তাঁহার প্রাণের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগদিন্দু বলিল,—

"তুমি জাননা অনু, ভগবৎ প্রেরিতের মত তুমিই এই মহামন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছ আমায়। আমরা বৈরাগী—বৈরাগীর সংসার নাই।

প্রাণ দৃঢ়করে কর্ম্মস্রোতে ডুবে থাক। দু'দিন পরে আবার ফিরে আসবেন তিনি। অনু, তিনি যে মা! সন্তানের উপর মায়ের অভিমান ক'দিন স্থায়ী হবে? তিন দিনে অভিমান গলে গিয়ে আবার স্নেহের আকর্ষণে অধীর হয়ে ছুটে আসবেন তিনি!"

বলিতে বলিতে—প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাসের বিমল জ্যোতিঃতে জগদিন্দুর বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

দূরে দেব-মন্দিরের অবরুদ্ধ দুয়ারে প্রণাম করিয়া সত্যভামা ও শ্রীধর জনৈক ভৃত্য সহ গৃহত্যাগ করিলেন। নীরবে পুত্র, পুত্র-বধূ মাতৃপদপ্রান্তে, নমিত হইল।

অভিমানিনী সত্যভামার অাঁখিপদ্ম প্লাবিত করিয়া শ্রাবণের বন্যা বহিয়া গেল।

বহুদূর পর্য্যন্ত পলকবিহীন দৃষ্টিতে মাতৃভক্ত দম্পতি মায়ের পানে চাহিয়া রহিল। সত্যভামা অদৃশ্য হইয়া গেলে অনুশীলার চমক ভাঙ্গিল। বিরাট-মনোবেদনায় সে বলিতে লাগিল,—

"না—না—মাকে ফিরিয়ে আন, মায়ের কোলছাড়া হয়ে থাকতে পারব না। ওগো—ওগো—তোমার প্রাণ কি পাথর দিয়ে গড়া?"

"হবে—নৈলে মা চিনলেম না!"

ভাব বিহ্বল যুবক পাথর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। চক্ষে প্রবল অশ্রুধারা, বক্ষে ঘন দীর্ঘশ্বাস!

"এবারটি মাফ্ কর্ত্তে হবে কর্ত্তাবাবু। তারপর কয়টা দিন আর? এই ফশলটা উঠে গেলেই কড়ায় ক্রান্তি খাজনা গুণে দিয়ে যাব, তাতে আর একটা কথাও কইতে হবে না।"

বলিয়া মিঃ শ্যাটোর সম্ভ্রান্ত মাতব্বর প্রজা করিমশেখ জোড়করে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

শ্যাটোর বিশাল কাছারী বাড়ীতে বহু লোক সমাগম হইয়াছে। একখানা আরাম কেদারায় স্বয়ং শ্যাটো গড়গড়ার নলটি হাতে করিয়া বসিয়া আছে। বৃহৎ তাকিয়ার দুই পার্শ্বে ফরাশের উপর অনন্তদেব এবং নবগোপাল।

দুই ধারে কলম কাণে গুঁজিয়া এক একটি কাঠের বাক্সের পশ্চাতে, জমাওয়াশিল তলববাকির অগাধ তেরিজবারিজ গর্ত্তে ভাবমগ্ন ভাবে দেড় ডজন পরিমিত গোমস্তাবর্গ বসিয়া আছে। নিম্নে,—অনুচ্চ, লম্বিত কাষ্ঠাসনে প্রজাগণ এবং দরজায় দেশীয় বিদেশীয় পাইক বরকন্দাজগণ যথাযোগ্য বংশদণ্ড হস্তে দণ্ডায়মান।

বহুবৎসরব্যাপী মোকদ্দমার দরুণ শ্যাটোর ভাণ্ডারে অর্থ নাই। অধিকন্তু সে মহা ঋণজালেও জড়াইয়া পড়িয়াছে। বড় হিস্যার বিষয় হস্তগত হইলে, সে কড়া শাসনে প্রজাগণের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

ঋণপরিশোধ করিয়া অচিরে তাঁহার ধনভাণ্ডারে যথেষ্ট

অর্থসঞ্চয় করিবার বলবতী ইচ্ছায় শ্যাটো প্রতিদিন দুই এক গ্রামের প্রজাদিগকে তলপ করিয়া বিষম উৎপীড়ন করিয়া টাকা আদায়ের চেষ্টা করিতেছে।

কাজেই করিমের কথায় কর্ণপাত করিবার মত মেজাজ বা অভিরুচি শ্যাটোর ছিল না। আরক্ত নয়নে উচ্চৈঃস্বরে তাই সে বলিল,—

"ও সকল আবদারের কথা আমি শুনতে চাইনা—আজই পাওনা টাকা সমস্ত মিটিয়ে দিতে হবে।"

করিম নানাপ্রকার দৈব দুর্বিপাক এবং পারিবারিক বিপৎপাতে অধুনা অত্যন্ত লাচার হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি, স্বগ্রামের মধ্যে সৎ চরিত্র এবং বুদ্ধিবলে তাঁহার মর্য্যাদা এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

আজ, বাড়ী হইতে আসিবার সময় বেচারা খোদাতাল্লার দোয়া ভিক্ষা করিয়া দুই ফোঁটা অশ্রুমোচন করিয়া আসিয়াছে—যেন তাহার 'বেইজ্জত হইয়া গৃহে ফিরিতে না হয়।'

শ্যাটো জবরদস্ত্ জমিদার। বিশেষতঃ উভয় হিস্যার ষোল আনা জমিদারী হাতে পাইয়া তাঁহার দাপট দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই তাহার ভয়ে প্রজাগণ সদাই শঙ্কিত হইয়া থাকে। অনেক কষ্টে মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিয়া করিম বলিল,—

"ইন্সাফ্ কর হুজুর! এই মাগ্গি গণ্ডার দিনে ফশল না উঠলে কোত্থেকে দেড়কুড়ি টাকা দিই। দুই বছর ধ'রে অজন্মা, তার উপর একটা বছরের ভিতর তিন তিনটা লায়েক ছাওয়াল আমাকে ছেড়ে গেল। ভিটার ঘর, গোয়ালের গরু সব খুঁইয়ে বিবির

হাতে দুগাছি কাচের চুড়ী সার করেছি। আজ কচি মেয়েটার বাউটী জোড়া বেচে সাতটি টাকা এনেছি। পাঁচ টাকা জমা দেব, আর বাকি দুই টাকার ধান কিনে নিলে তবে ছাওয়াল বাচ্ছারা দুইদিন পরে একমুঠা মুখে গুঁজতে পাবে। তুমি মা বাপ, একটা মাস মেহেরবাণী কোরে স'য়ে যাও—তার পর আর আমাকে কইতে হবে না।"

বলিতে বলিতে করিম ছল ছল চক্ষে শ্যাটোর পানে চাহিয়া রহিল।

শ্যাটোর কাছে দয়া ভিক্ষা করা, আর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মুখ হইতে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করা—দুইই সমান কথা। চীৎকার করিয়া শ্যাটো অধৈর্য্য ভাবে বলিতে লাগিল যে,—

'তাহার বদমায়েস প্রজাদের চিনিতে বাকি নাই। অন্য সকল কাজ অবাধে চলিয়া যায়, কেবল জমিদারের খাজনা দেওয়ার বেলাই যত মিথ্যা ওজর ওজুহাত! সে আজ কিছুতেই কাহাকেও ছাড়িয়া দিবে না। যদি অপমানের ভয় থাকে তাহা হইলে করিমদ্দি এখনই সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিয়া যাক্।'

করিমদ্দি মনে মনে প্রমাদ গণিল। 'ইজ্জত খুঁইয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বরং ইজ্জত বজায় রেখে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।' এই ভাবিয়া সে সাতটি টাকা সমুদয় শ্যাটোর পায়ের কাছে রাখিয়া সজল চক্ষে বলিল,—

"এই নাও কর্ত্তা। এত্‌বার কর—আর একটা কাণা কড়িও আমার নাই। যা আছে জমা করে নাও—তার পর খোদা যদি

খানাবেগর জানে মারেন, তাই মরব। আমায় বেইজ্জত করো না সাহেব—এতটুকু অনুগ্রহ কর।”

এই সময় একটা বীভৎস হাস্যতরঙ্গে সমবেত প্রজামণ্ডলীর প্রাণে বিষম বিভীষিকা জাগাইয়া তুলিয়া অনন্তদেব কর্ত্তার হইয়া বলিতে লাগিল,—

“সে কি হে করিমদ্দি? অন্যায় করে কাঁদ্‌লে ত আর টাকার কাজ চলবে না। দাও ত হে বামুণ ঠাকুর—করিমের বাকিজায় ফর্দ্দটা।”

বলিয়া সর্ব্বজনের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে সেই মহামূল্য ফর্দ্দখানা তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন,—

“তোমার কিস্তির খাজনা হোল গিয়ে পাঁচ টাকা আট আনা। তার পর জলকর, পথকর, পাব্লিকর, মাথট, চৌথকর, সব মিলিয়ে ধরে নাও তোমারগে সাত টাকা সওয়া নয় আনা। পার্ব্বনী, দস্তুরী, হিসাব—আনা, সালিয়ানা হোল গিয়ে ধরে নাও—তিন টাকা পাঁচ আনা সাত পাই। তোমার বাপের ফয়তার রাজধৃতি পাঁচ টাকা, তমুর বিয়ের তিন টাকা, বড়হিস্যার জমিদারী দখলের নজরাণা তোমার হোল গিয়ে এই দশ টাকা।

“বাস্! মিলিয়ে নাও কড়ায় গণ্ডায় কাঠার কিয়ার হিসেব কোরে সরকারি পাওনা হোল তোমার এই—আটত্রিশ টাকা সওয়া এগারো আনা! আর তুমি কিনা সাতটি টাকা এনে হাজির কর্লে? চক্ষের ফোঁটা তুচ্চার পানী খরচ করে কিস্তি মারতে চাও বাপু! এটা কি উচিত হলো করিম? বলত তোমরা পাঁচজনে বিচার কোরে!”

সুদীর্ঘ বক্তৃতান্তে অনন্তদেব নীরব হইলেন। ক্ষণকালের জন্য শ্যাটোর দরবারে একটা ম্লান নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। একটা প্রবল দীর্ঘ-শ্বাসে বক্ষের পাঁজরার হাড়গুলি কাঁপাইয়া করিম বলিল,—

"ঠেকা ডিঙ্গির বাইছ্ নাই সাহেব—এই আমার আছে, আর নেই।"

অমনি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারের হুকুমে উলঙ্গপ্রায় করিমের কাছা কোঁচা সমস্ত তল্লাস করিয়া দেখা হইল যে আর কোথাও লুকান কিছু আছে কিনা। ব্যর্থ আশার তীক্ষ্ণ কশাঘাতে তখনই হুকুম হইল—

"মোতাদিন শুকুল! লে যাও শূয়ারকো, দেউরীমে দিনভর ধুপ্‌মে খাড়া রাখো। কপালমে পৈরেণ চড়ায়কে—সম্‌ঝো?"

নেমকহালাল মোতাদিন অমনি মনিবের হুকুম তামিল করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া করিমের হস্ত ধারণ করিল।

এই অভিনয় আজি নূতন নহে। নিত্য নানা প্রকার নূতন নূতন উৎপীড়ন-প্রণালী অবলম্বনে প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা হইত। কাজেই ব্যাপারটা সকলের কাছেই এক প্রকার স্বাভাবিক হিসাবে 'গা সহা' হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ব্যাভিচার চরমে উঠিলে তাহার প্রতিক্রিয়া প্রকৃতির নিত্য নির্দ্ধারিত নিয়মের মতই ঘটিয়া থাকে। শ্যাটোর অত্যাচার, প্রবঞ্চনা, ব্যাভিচারের মাত্রাও চরমে আরোহণ করিয়াছে, তাই

আজ তাহার জমিদারীর আবহাওয়াও এক মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে।

মোতাদিন করিমের গায়ে হস্তার্পণ করিতেই—তাহার দূর-সম্পর্কিত এক ভাগিনেয়—সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ মফিজ—উঠিয়া দাঁড়াইল। সমবেত প্রজামণ্ডলীর মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের ভাব জাগিয়া উঠিল। যাহা হউক অপেক্ষাকৃত বিনীতস্বরে মফিজ বলিল,—

"খুব হ'য়েছে সাব—বাস্! এখন মামুর হাতটা ছেড়ে দিতে বল।"

"তোম কোন হ্যায় শূয়ার? আমার মুখের উপর লম্বা বাৎ করণেকো আয়া হায়—হারামজাদা—"

সমবেত সমস্ত প্রজার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। এক শুভ্রগুম্ফ শোভিত প্রশান্তবদন বৃদ্ধ অমনি বলিয়া উঠিল,—

"ফিরিয়ে নাও সাহেব, তোমার নোংড়া গালটা ফিরিয়ে নাও। আল্লার নামে—নবীর নামে কশম খেয়েছি—তোমার গায়ে হাত তুলব না! ঐ নোংড়া গালটা তোমার ফিরিয়ে নাও।"

বলিতে বলিতে সৌম্য, প্রশান্ত, দিব্য-কান্তি, জ্ঞানবৃদ্ধের দুইটি গণ্ড বহিয়া প্রবল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

ঘৃত প্রক্ষেপে অনলের মত, প্রদীপ্ত ক্রোধে জ্বলিয়া খ্যাটো চীৎকার-স্বরে কি বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অতিশয় ক্রোধে তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। হিংস্র, বীভৎস, জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে সে জনৈক পাইকের পানে চাহিল।

তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধ বলিল,—"রেখে দাও

সাহেব তোমার—ডাল কুত্তার মত চোখ রাঙ্গানি! আমার নাম সমসেরশেখ। তোমার নানা যখন বেঁচে ছিলেন তখন তিনি আমাকে তাঁর পাশে ঐখানে বসতে দিতেন—আমার কথায় তাঁর জমিদারী চলতো। পুছ্ কর ঐ কোণের ঐ বুড়ো থুব্ড়ো আচার্য্যি মশায়কে।

"তারপর তোমার আমলে এই বুড়াকে তোমার কাছারীতে একদিনও দেখ নাই। তোমার পাইক বরকন্দাজ কে আছে ডাক দেখি! আমার এই হাওয়ায়-পড়া হাড় কখানাতে হাত ছোঁয়াবার হিম্মত আছে কার?"

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বৃদ্ধ আবার বলিল,—

"দুই দুইটা বছর রাইয়তের পেটে ভাত নাই—তোমার নানা বাঁইচে থাকলে আজ তোমার বাড়ী দানছত্তর খুলে রাইয়তের মুখে ভাত দিয়ে, তবে নিজে খানা মুখে তুলত। আর তুমি? প্রজার রক্ত শুষে খাচ্ছ, তাদের মুখের পানেও ফিরে চাইছ না! আর, যাদের দোস্তির দৌলতে তোমার নানা এই রাজত্বি গড়ে তুলেছিল, তুমি দুঃসময়ে তাদের মান ইজ্জতের ও একটু খাতির কচ্ছ না।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ আবার আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে নির্ব্বাক হইল।

ব্যাপার দেখিয়া অনন্তদেব শ্যাটোর কাণে কাণে বলিল "গতিক খারাপ, একটু চেপেই যান।"

কিন্তু শ্যাটোর মাথায় তখন শয়তানের বিশ্ব বিনাশিনী বুদ্ধি সুদৃঢ়ভাবে চাপিয়া বসিয়াছিল। অনন্তের সুপরামর্শে কর্ণপাত করিবার স্পৃহা তাহার হইল না।

জনৈক হিন্দুস্থানী বরকন্দাজকে শ্যাটো অশ্লীল উগ্র ভাষায় সমসেরের ধৃষ্টতার জন্য তাহাকে কড়া শাসন করিতে আদেশ করিল।

অমনি সমবেত জনসঙ্ঘ ঘোরতর উত্তেজিত হইয়া গাত্রোত্থান করিল। সমসেরের অনুরোধে সকলে নীরবে প্রাঙ্গণে তাহার আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল। সমসের আবার শ্যাটোকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—

"শোন সাহেব! মনে করোনা আমরা চাষা বলে কিছুই বুঝি না। ঐ বুড়ো বাঁদর দেওয়ান যে ফর্দ্দ শুনালে—তাতে কোরে করিমের কাছে তোমার ন্যায্য পাওনা মাত্র সাড়ে পাঁচ টাকা, তা তুমি পেয়েছ।

"বার হাত লাউ, তার তের হাত বীচি—সে আমরা বুঝতে পারি। তবে, তাও এদ্দিন দিয়ে এসেছি; কেন জান? কেন না—আমরা শান্তিতে থাকতে চাই। আর, তোমরা ত আমাদের সাত দরজার কুত্তা—আমরা না দিলে তোমরা খাবে কি? তাই।

কিন্তু আর না। ন্যায্য খাজনার উপর এক ক্রান্তি আর বাড়তি জমা আমরা দিচ্ছি না। আজ থেকে আমার গাঁয়ের খাজনা, আমার একলার হাত দিয়ে তুমি ঘরে বসে পাবে। এমন সকল গাঁয়ে এক একজন মোড়ল আমিই ঠিক কোরে দেব। আজ থেকে আর কেউ তোমার ডাকে তোমার কাছারীতে আসবে না জেন! বাস্—রোকশোদ্।"

বলিতে বলিতে সমসের প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইল। সকলে সমবেতকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া শ্যাটোর বাটী অতিক্রম করিয়া চলিল।

যাইতে যাইতে ক্ষোভে ঘৃণায়—কর্কশ কণ্ঠে বৃদ্ধ সমসের সকলকে বলিতে লাগিল,—

"তখন বলেছিলেম না, যে এই হারামখোর, বেইমানের কাছে দরিয়াপ পাবি নি? তবু বড়, জাঁক করে এসেছিলি, দশ বৎসর পর এই বুড়োকেও টেনে এনেছিলি। এখন ছাখ—জমিদার তোদের কে! জমিদার আর মহাজনকে গতরের সমস্ত রক্ত ঢেলে দিয়েছিলি। চশমখোরের জাতের চক্ষের পরদা তাইতেই আরো বেশী পাতলা কোরে দিয়েছিস।

"গতরভাঙ্গা শ্রম ক'রে ফশল পয়দা কচ্ছিস তোরা—রদ্দুর বৃষ্টিতে তেতে ভিজে, পাথর মাটিতে সোণা পয়দা কচ্ছিস তোরা! আর তোদেরই পয়সায় নবাবী কোরে জানোয়াররা আবার তোদেরই রোদে খাড়া কোরে রাখছে; নেংটো করে বেত মারছে, জুতো মারছে। তবু মুখ্যু তোরা—পাঁচ টাকা খাজনা আর পয়ত্রিশ টাকা টেক্স দিয়ে রাজ সম্মানে সেলাম ঠুকছিস—এই ক্ষুদে রাজার পায়ের তলায়!"

সমসের এই প্রকার বহু উত্তেজনাপূর্ণ জ্বালাময়ী ভাষায় সকলকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিল। সকলের মুখে স্থির প্রতিজ্ঞার ছায়াপাত হইল। সমসেরের উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে সেইদিন সেইখানে সকলে 'হজরতের' নামে শপথ করিল।

এদিকে প্রজাবর্গ দল বাঁধিয়া সুপক্ক কদলী ফল প্রদর্শনান্তর চলিয়া গেলে, গুণ্ডাটো আহত গর্ব্বাভিমানের দুঃসহ গাত্রপ্রদাহ—পাইক বরকন্দাজদিগকে তিরস্কার করিয়া শীতল করিবার প্রয়াস করিল।

... একে একে সমস্ত দেশীয় পাইকগণ লাঠি শোটা রাখিয়া তদ্দণ্ডে ... ইস্তফা দিয়া গেল।

বহু প্রাচীন পাইক জমীর সরদার সকলের মুখপাত্র স্বরূপ যাইবার সময় বলিয়া গেল,—

"শোন সাহেব! তিন পুরুষ তোমার নিমক খেয়েছি বলে এত দেখে শুনেও সব স'য়ে ছিলেম। আমাদের দুঃখ তুমি বুঝবে না। নৈলে, তোমার হুকুমে আমারই জাতভাই—সুখ দুঃখের সহায় যারা, তাদের ভিটা মাটি উচ্ছন্ন কোরেছি! শেল কুকুরের মত তুমি চিরদিন তবু ঘেন্নায় আমাদের একটা মিঠা কথাও কও নাই। আর না—আজ এই শেষ কোরে চল্লেম। খোদা খেতে দেন খাব, নয়ত না খেয়ে মরব! কিন্তু তবু তোমার হারামীর আর কোন সহায়তা করব না—বাস্।"

এত অপমান শ্যাটো তাহার জমিদারী জীবনে আর কখনও হয় নাই। সে বুঝিল না যে সময় বলিয়া বড় একটা নিত্য সত্য অমোঘ বস্তু নিয়মিতভাবে মানুষের পৃষ্ঠলগ্ন হইয়া থাকে।

সুসময়ে কটু তিক্ত ভাষাও অমৃত ফল উৎপাদন করে। কিন্তু দুঃসময়প্রত্যূষে সকলই বিপরীত ভাব ধারণ করিয়া বসে।

তাহার শুভগ্রহের স্থিতিকাল শেষ হইয়াছে; আজ হইতে বিষম কুগ্রহ তাহার স্কন্ধলগ্ন হইল। এখনও বুঝিয়া চলিলে তাঁহার অমঙ্গলের মাত্রা লাঘব হইতে পারিত। কিন্তু গ্রহফলে দাম্ভিক যুবক দ্বিগুণ প্রতিহিংসার তৃষ্ণায় চেতনা হারাইয়া ফেলিল।

তাঁহার কল্পিত শুভানুধ্যায়ী—কৈতববাদী, স্বার্থপর, চাটুকার

আমলাবর্গও সময় বুঝিয়া নানাপ্রকার উত্তেজনাবাক্যে তাহাকে বিশেষরূপে উষ্ণ করিয়া তুলিল।

অনন্তদেব বলিল "ছোট লোকের জোঁট আমি অনেক দেখেছি! দেখুন না তিন দিনে আমি সব বেটাকে লম্বা কোরে দোব—তবেই আমার নাম অনন্ত শর্ম্মা।"

অন্যান্য আমলা কর্ম্মচারীবর্গ গ্রীবা বাঁকাইয়া তাহাতে সায় দিল।

নবগোপাল বলিল,—"কিসের ভাবনা তোমার বোনাই সাহেব? জেলার জজ মাজিষ্টর ত তোমার হাতধরা। দিদিকে নিয়ে সদরে গিয়ে তুমি—একটু স্বদেশীগন্ধ এর মধ্যে মাখিয়ে, তাঁদের চাঙ্গা কোরে তোল, আর ভেট্‌ চালাতে থাক! আমরা রইলেম—এই সি-আই-ডি, আর থানার তাঁদের হাত কোরে কেমন কুরুক্ষেত্র—লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে দি দেখ না। চাষার আবার ধর্ম্মঘট! এই একে দিয়ে ওকে, তাকে দিয়ে তোকে—করে, কেমন ঘরে ঘরে বিভীষণের সৃষ্টি করে তুলি চেয়ে দেখনা।"

অর্দ্ধ আশ্বস্ত, অর্দ্ধ ভাবনাবিব্রত শ্যাটো অন্যমনস্ক ভাবে নীরবে গাত্রোত্থান করিল। বিষম অন্তরজ্বালা জুড়াইতে সে অহোরাত্র রক্তিম তরল—মাধ্বী, কাতম্ব, গৌরী প্রভৃতির নূতন বিলাতি সংস্করণ সুধার বন্যায় ডুবিয়া রহিল।

হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া কথাটা তড়িৎ বেগে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌঁছিল। শ্যাটোর অত্যাচারে জর্জ্জরীভূত প্রজাসঙ্ঘ অনেক দিন ধরিয়া প্রাণে প্রাণে দারুণ উত্তেজনার চাপা অনলে দগ্ধ হইতেছিল।

অকস্মাৎ কার্য্যকারণের বাতস্পর্শে বিরাট জনসঙ্ঘ এক সঙ্গে উত্তেজিত ভাবে জমিদার বাড়ী অভিমুখে ধাবিত হইল।

শ্যাটোর বাড়ীর অদূরে মুক্ত প্রান্তরে সহস্র সহস্র ভদ্রাভদ্র নিরীহ গ্রাম্যপ্রজাবর্গ সম্মিলিত হইয়া তাহাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে রত হইল।

দারুণ গ্রীষ্মের মার্ত্তণ্ড-তাপ-তপ্ত মস্তিষ্ক এবং বিষম অপমান, লাঞ্ছনা-জনিত অন্তর জ্বালার একত্র মিলনে সকলের মানসিক অবস্থা তখন তপ্ত বারুদপূর্ণ আতসখানার ভাব ধারণ করিয়াছিল। সামান্য একটু স্ফুলিঙ্গ-স্পর্শেই তাহাতে বিশ্ব বিদহমান মহা অনলের সৃষ্টি হইতে পারিত।

অতিশয় বুদ্ধি অনন্তদেব তখন সেই পথে গৃহে যাইতেছিল। তাহার ধারণা—শ্যাটোর উপর প্রজাদের যতই ক্রোধের কারণ থাকুক না কেন, তাঁহার ব্যবহারে সকলেই তাহার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত।

এমনি এক একটা ভুল ধারণায় অতি বড় কুটবুদ্ধি ধুরন্ধরগণও মহা বিপদে পতিত হয়। অথবা তাহার গ্রহের আকর্ষণও হয়ত এবম্বিধ স্বখাদ শঙ্কট গর্ত্ত সৃজনের জন্য দায়ী হইতে পারে।

অনন্ত ভাবিল 'মূর্খ নিরক্ষর সরলপ্রাণ গ্রাম্য কৃষকদের দুইটা মুরুব্বিয়ানার ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে যদি বশীভূত করা যায়, তাহা হইলে শ্যাটোর কাছে তাহার পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ হইয়া রহিবে। একত্রে এতগুলি লোককে আর পাওয়া যাইবে না।' তাই উন্মীলিতপক্ষ পতঙ্গ বিশেষের মত গ্রহ-বিতাড়িত, সুলভ যশঃলিপ্সু বৃদ্ধ, ধীরে ধীরে সেই জনসমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিল।

অদৃষ্টের ফল খণ্ডান যায় না। অসাম অনন্ত জনতরঙ্গের মধ্যবর্ত্তী হইয়াই অনন্তদেব স্বীয়ভ্রম বুঝিতে পারিল। কিন্তু তখন আর তাহার ফিরিবার পথ ছিলনা। ক্ষণেক ভাবিয়া বৃদ্ধ মিলিত প্রজামণ্ডলীকে দুই একটা প্রবোধবাক্য বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত, অন্ধ, অজ্ঞ যাহারা—শক্তিমদিরার নেশায় তাহারা মনে করে যে, নিরক্ষর কৃষকগণের হিতাহিত বিচার শক্তি নাই।

কিন্তু কার্য্যতঃ যাহারা এই অক্ষর-পরিচয়হীন সৎ চিন্তারত বিরাট প্রজাশক্তির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহারাই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ইহাদের সাধারণ জ্ঞান অনেক পুঁথীগত বিদ্যাভিমানীর অপেক্ষাই প্রখর।

প্রজারা ভালমতই জানিত যে, বৃদ্ধ অনন্তই শ্যাটোর প্রধান কুগ্রহ। ইহারা প্রাণে প্রাণে তাই অনন্তদেবকে অধিকতর ঘৃণার চক্ষেই দেখিত। ফলতঃ, তাহাকে দেখিয়া তাহারা বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

ভাগ্যক্রমে দেশের প্রায় সকলেই আজি এক বিরাট পুরুষের অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত, তাই সমসের-প্রমুখ বৃদ্ধগণ অল্পকথায় অনন্তের অন্তহীন অবিমৃষ্য মূর্খতার কথা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে নিরুপদ্রবে বিদায় করিয়া দিল।

তথাপি তরুণের দল সকল সময়, সকল দেশেই যেমন হয়, তেমনি কতিপয় যুবক নিভাঁজ সরল অহিংসভাবে সুদীর্ঘ স্মরণার্থ, দুই চারিটি চোরা ঘুষি, কিল, থাপড় প্রদানে আপ্যায়িত করিয়া অনন্তদেবের

বার্দ্ধক্য-জীর্ণ পঞ্জরাস্থিতে, বেদনার কারণ জন্মাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করিল না।

সমসের প্রভৃতি নেতৃবর্গ সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই বেদনাকাতর, ততোধিক আতঙ্ক-বিহ্বল, প্রায় লুপ্তচৈতন্য—অনন্ত শর্ম্মা ভূমিগাত্র আশ্রয় করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অচিরে তিনি পাড়ার জনকয়েক কর্ম্মীর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া স্বগৃহে খট্টাঙ্গতলে শয্যাশ্রয় করিলেন।

বৃদ্ধের করুণ, আর্দ্র, আর্ত্তনাদের সঙ্গে গৃহিণীর গগন-বিদারি ক্রন্দন-রোল এবং শ্রাবণ-প্লাবনাশ্রু একত্র হইয়া অনন্তের শুভ অনন্তশয্যার কথা গ্রামময় ছড়াইয়া দিল।

---

(৫)

সত্যভামা দেবীর ৺কাশীধাম যাত্রার পর হইতে উত্তরোত্তর একটা ঘন মলিনতার ছায়া পড়িয়া অনুশীলার প্রাণের স্বস্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। শৈশব হইতে মাতুলান্নে প্রতিপালিতা, পিতৃহীনা অনুশীলা মাতুলানীর লোকদেখান আদর যত্নের মধ্যে এতটুকু মাতৃত্বের স্নিগ্ধতা খুঁজিয়া পায় নাই।

কৈশোরে বিরাট আশা, আশঙ্কা লইয়া অনুশীলা যখন প্রথম জগদিন্দুর গৃহে আসিল, সেই সময় সে জীবনের প্রথম সত্যভামার

নির্ভাঁজ প্রাণের কোমল, কর্কশ, নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের মধ্যেও সত্য মাতৃভাবের পরিচয় পাইয়াছিল।

সত্যভামা কখনও প্রাণের কথা চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না। একটুকু অন্যায় করিলে তাহার জন্য তিনি অনুশীলাকে দশগুণ তিরস্কার করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। পক্ষান্তরে সামান্য প্রশংসার কার্য্যেও তিনি বধূর অতিরিক্ত গুণগান করিতেন। এই তিরস্কার প্রশংসা উভয়ের ভিতরই এমন একটা আন্তরিকতা ছিল, যাহা কেবল নিঃস্বার্থ মাতৃত্বের মধ্যেই পাওয়া যায়।

এই ভাবে অনুশীলা অকৃত্রিম মাতৃত্বের অধিকারে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সংসারের প্রত্যেক খুঁটি নাটি ব্যাপারেই সত্যভামার একান্ত মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। তাই আজি সত্যভামার অনুপস্থিতিতে অনুশীলা বড়ই অসহায় হইয়া পড়িয়াছে।

সত্যভামা সাধারণ দশজনের মতই সঙ্কীর্ণতামূলক শিক্ষা এবং সংস্কারের বশবর্ত্তিনী। কিন্তু তাঁহার প্রাণের শুভ্রতা—উন্মুক্ত হৃদয়ের অবাধ স্বাধীনতা, অতি অল্পলোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

তাই অনুশীলা সত্যভামার প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই অপূর্ব্ব মাতৃত্বের স্পর্শ অনুভব করিয়াছে। অনুশীলা কোনও দিন সত্যভামার তিরস্কার, বা কঠোরতা কিছুই গায়ে মাখিয়া লয় নাই। আজি অনুশীলা সত্যভামার অদর্শনে—বিশেষতঃ, তাঁহার সংসার ত্যাগের মূলীভূত কার্য্যকারণ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে।

সংসারে কোনই কাজ নাই। থাকিলে হয়ত কাজের ব্যস্ততার মধ্যে অনুশীলা বিস্মৃতির শান্তি লাভ করিতে পারিত। দুই দিন

ভাবিয়া তাই আজি অনুশীলা অন্দরের ক্ষুদ্র পরিবারের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দেবভাণ্ডার হইতে আনাইয়া অতি প্রত্যুষে কর্ম্মস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে।

ভোর না হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দয়িতার সঙ্গে অনুশীলা নানাবিধ ফুল তুলিয়া আনিল। মাতা-কন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া মালা গাঁথিয়া এক প্রস্ত ফুল ঠাকুর বাড়ী পাঠাইয়া দিল। স্নানাদি সমাপন করিয়া বাকি ফুলদূর্ব্বাদি সত্যভামার পূজার ঘরে রীতিমত সাজাইয়া পূজার সর্ব্ববিধ আয়োজনান্তে ধূপ, ধূনা, নৈবেদ্য পূজার আসন নিম্নে স্থাপন করিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া অনুশীলা সেই গৃহে গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি পাঠ করিল। তাহার পর ভক্তিভরে মাতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পূজার ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিল।

এই ভাবে একাগ্রনিষ্ঠার সহিত সত্যভামার পূজার গৃহে অনুশীলা প্রাতঃকাল হইতে মধ্যরজনী পর্য্যন্ত যথারীতি পূজা, আহ্নিক, ভোগ, আরতি, পাঠ ও ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করিতে লাগিল।

যথাকালে পাড়ার অনেক মহিলাবৃন্দ আসিয়া অনুশীলার সঙ্গে মিলিত হইল। ক্রমে সেই পবিত্র মাতৃ-পূজামন্দির পল্লী-মহিলাগণের কাছে ধর্ম্মচর্চ্চা, নীতিকথা এবং শিল্পশিক্ষার একটি কেন্দ্র হইয়া উঠিল।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সামান্য জলযোগান্তে জগদিন্দু বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় দয়িতার হাত ধরিয়া শ্যামল সেখানে উপস্থিত হইল।

কয়েকদিন মানসিক কুয়াসাচ্ছন্ন থাকিয়া আজ দয়িতা "ঠাকুমার"

পূজা করিয়া প্রফুল্ল হইয়াছে। দিব্যফুলের মাল্যালঙ্কার পরিয়া, "ঠাকুমার" আশিস নির্ম্মাল্য মাথায় ধারণ করিয়া বালিকা শ্যামলদের বাড়ী গিয়াছিল। হৃষ্টচিত্তে শ্যামল তাহার সহিত খেলা করিতে ঠাকুর বাড়ী আসিয়াছে। জগদিন্দুর প্রাণ এই দিব্যদর্শন যুগ্ম শিশু হৃদয়ের অবাধ, সরল স্বাধীনতার মাধুর্য্যে ভরিয়া গেল।

শ্যামলকে ঘোড়া বানাইয়া, তাহার মুখে রাশ কশিয়া দিয়া—চাবুক হাতে ফুলের অপ্সরা দয়িতা তাহাকে তাড়া করিয়া চলিয়াছে।

আর গাহিতেছে,—

চল্ চল্ চল্—চল্‌রে ঘোড়া চল্,—
(দোব) আস্তাবলে চায়না দানা,
বালতী ভরা জল।

একান্ত অনুরক্ত ভক্ত শ্যামল দয়িতার চাবুকের ভয়ে ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই জনের হাসির তরঙ্গে দেবমন্দির-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

জগদিন্দু ভাবিল,—"হায় মূর্খ মানুষ! এমন অনাবিল আনন্দের হিল্লোলে ক্ষুদ্র জীবনতরণী না ভাসাইয়া, তোমরা কেন পরস্পর কলহ বিবাদে অশান্তির সমুদ্রে ডুবিয়া মর!"

অনুশীলা কার্য্যব্যপদেশে সেই পথে যাইতেছিল—জগদিন্দুর প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া সে তাহার সহিত মিলিত হইল।

"আবার অন্দরে সংসার পত্তনের আড়ম্বর চলছে শুনলেম।" বলিয়া জগদিন্দু অনুশীলার চিবুক স্পর্শ করিলেন।

"মা গিয়ে অবধি আর কিছুই ভাল লাগছে না। তাই আবার

একটা খেলাঘর পেতে দেখছি, যদি ভুলে থাকতে পারি।” অনুশীলা অন্যমনস্কে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

গর্ব্বের স্বরে জগদিন্দু একটু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল,—“তা বেশ। শুনছি পাড়ার আরও অনেকে তোমার খেলায় যোগ দিতে আসেন?”

একথার উত্তর দিতে অনুশীলা প্রথমে একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। তাহার পর মৃদু মধুর সঙ্গীত ঝঙ্কারে বলিল,—

“জানিনা কেন আসে—দুই চারিজন নয়, চার পাঁচ গ্রামের মেয়েরা প্রায় নিত্যই আসে। মায়ের পূজার ঘরে আমরা আলোচনা, পাঠ, প্রার্থনা এই সব করি। আবার সাত আট জনে জুটিয়া সূতাকাটা, জামা সেলাই, ছবি আঁকা আরও নানা শিল্প চর্চ্চার ভার নিয়াছে। আমাদের ‘ফণ্ডে’ এরই মধ্যে অনেক টাকা উঠেছে। একবার ও ঘরটা দেখে এসো গিয়ে।”

বলিতে বলিতে অনুশীলা অবনত মস্তকে বাম হাতের আঙ্গুলের নখগুলি ডান হাত দিয়ে খুঁটিতে লাগিল।

জগদিন্দু সকল কথাই জানিত। সে গোপনে তাহার মায়ের ঘরটি দেখিয়াও আসিয়াছে। তাঁহার পুস্তকগুলি এতদিন পোকায় কাটিতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি সেই সকল বইগুলি আবার মালক্ষ্মীদের একাগ্র কর্ম্ম-কুশলতার ফলে—চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে ভাবে গোছান হইয়া আলমারীর শোভা বাড়াইয়া তুলিয়াছে—তাহাও সে লক্ষ্য করিয়াছে।

শতাধিক চরকা, দুইখানা তাঁত আরও কত বস্তুতে অন্দরের

আঙ্গিণা ভরিয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া গর্ব্বে আনন্দে তরুণ কর্ম্মবীরের প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

তাই সে বলিল—"সবই দেখেছি অনু—খুব একটা গর্ব্বও বোধ কচ্ছি, কিন্তু বড় দুর্ব্বল আমরা, তাই ভেবে এক এক সময় মনে দুর্ব্বলতাও এসে পড়ে।"

এবার অনুশীলার মুখ খুলিল। দৃঢ় বিশ্বাসজনিত স্থির গম্ভীর ভাবে সে কহিল, "কর্ম্মেই অধিকার আমাদের—ফলাফলে কারু ত হাত নেই।"

এমন সময় সমসের ধীরে ধীরে সেখানে উপস্থিত হইয়া আভূমি-প্রণত শেলামান্তে বলিল,—"মা একটু ভিতরে যান। অনেকগুলি গাঁয়ের লোক বাবুর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছে।"

অনুশীলা ঘোমটা টানিয়া অন্দরে প্রস্থান করিল।

ক্ষণপরে পঙ্গপালের মত সহস্রাধিক গ্রাম্য হিন্দু-মুসলমান—গৃহস্থ চাষীতে নাটমন্দির ভরিয়া গেল। সকলে একে একে যথাযোগ্য সেলাম, অভিবাদনান্তে জগদিন্দুর সম্মুখে এক হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত 'নজর' প্রদান করিয়া মুক্ত ভূমি-গাত্রে বসিয়া পড়িল।

বিস্মিত স্তম্ভিত জগদিন্দু বিহ্বলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—হর্ষোৎফুল্ল শ্যামল ও দয়িতা আসিয়া তাঁহার দুই হাত ধরিয়া দাঁড়াইল।

বিস্ময়ের প্রথম চমক ভাঙ্গিলে জগদিন্দু বলিল,—"এসব কি সমসের?"

"কি তা জানি না কর্ত্তা। সাত পুরুষ তোমাকে আজকের

দিনে নজর দিতে এসেছি, তাই আজও দিচ্ছি।" ভক্তি গদগদ-স্বরে এই কয়টি কথা বলিয়া সমসের নীরব হইল।

জগদিন্দুর মনে পড়িল সেই দিন রথ-দ্বিতীয়া; পুরুষানুক্রমিক এই শুভদিনে তাঁহাদের "পুণ্যাহ" হইয়া থাকে। দুই চক্ষু জলে ভাসাইয়া দিয়া জগত বলিল,—

"না, সমসের, আমার জমিদারীর বাঁধন ত ঘুচে গেছে। আজ আমিও তোমাদেরই মত দীন প্রজা। এ আমার প্রাপ্য নয়—ভোলনাথই এখন ষোল আনা জমিদারীর মালিক—এই নজর তারই প্রাপ্য।" ব্যগ্র সরলতার ভাব স্পষ্ট তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

সকলের মুখপাত্র রূপে সমসের দাঁড়াইল। স্থির গম্ভীর উচ্চকণ্ঠে সে বলিতে লাগিল,—

"তবে শোন কর্ত্তাবাবু। প্রজার কাছে নজরের দাবী আইন-কানুনে জমিদারকে দেয় নাই। সেই দাবী দিয়েছে যে, আইন-কানুনের ভাষায় তার কোন নাম তৈরী হয় না। জমিদার কে? চাষাই জমীদার—কেননা তারাই জমির প্রকৃত ভোগ-দখলের অধিকারী।

"জমীদার চাষীর প্রতিনিধি হ'য়ে রাইয়তের চাঁদা দেশের খাজাঞ্চির হাতে পৌছে দেয়—আমরা মূর্খ হ'লেও এই সত্য কথাটা বুঝি।

তবু নজর, বাজে জমা, আমরা জমিদারকে দিই—কেন দিই জান? প্রাণের টানে দিই। জমিদার আমাদের মুখচেয়ে থাকে, আমাদের হ'য়ে দশটা ভাল কাজ করে, দুর্ভিক্ষে অন্নছত্র, দানছত্র খুলে প্রজার প্রাণ বাঁচায়; রাস্তাঘাট, নদীনালা পুকুরঘাট, হাটবাজার

সব দিয়ে প্রজার অভাব অভিযোগ দূর করে—তাই দিই। আমরা জানি, আমাদের দিয়ে যখন তার টাট্ বজায় রাখতে হয়, তাতে আমাদেরই মান, তাই দিই।

সেই প্রাণের টানেই তোমাকে আজ নজর দিতে এসেছি। দুঃখ কি ছোট বাবু? তোমার জমিদারী গেছে কে বলে? লক্ষ রাইয়তের কল্জের উপর তোমার জমিদারী! লক্ষ প্রজা যখন বেঁচে রয়েছে, তখন তোমার জমিদারীও আছে। আর এই টাকা কি তোমাকে দিচ্ছি? না ছোট বাবু! সকলের প্রতিভূ হ'য়ে তুমি এই পরগণার প্রজার সুখ দুঃখ, অভাব-অভিযোগ দেখবে, শুনবে—সে'ত বিনা খরচে হবে না, তাই তোমার জিম্বায় আমাদের তহবিল রইল।"

বৃদ্ধের সমস্ত হৃদয় তখন দেশাত্মবোধের মহান পবিত্রতায় ভরিয়া গিয়াছে। সেই ভাববন্যার আবেগে তাহার কণ্ঠরোধ হইল।

ক্ষণকালের জন্য একটা বিরাট নিস্তব্ধতায় সেই জনসমুদ্র সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। বিষাদে, গর্ব্বে, দৈন্যে একটা পবিত্র বিহ্বলতার আবেশে জগদিন্দুও ক্ষণকাল কোন কথাই কহিতে পারিল না। ক্রমে আত্মসংযত হইয়া ধীরে ধীরে সে বলিল,—

"আমি বুঝ্তে পার্চ্ছি না, সমসের! আমায় বুঝিয়ে বল, কি মহান উদ্দেশ্যে তোমরা সমবেত জনমণ্ডলী আজি আমায় এই সম্মান দান কচ্ছ।"

সমসের নম্রভাবে বলিল,—"এর চেয়ে কি আর বুঝিয়ে বলব বাবু? আমরা যে চাষা, অত যদি পার্তেম তা হ'লে ত আর কোন

দুঃখই থাকতো না ছোট বাবু। আমাদের কথা হচ্ছে এই, যে খাজানা আইনত যা' আমাদের দেবার তা' পাবে ভোলানাথ বাবু—আইনের খাতিরে। আর বাজেজমা—যা আমরা আমাদের সুখ, দুঃখ, মান অপমান, সুবিধা, অসুবিধার জন্য দিই, তা' পাবে সে, আমরা সমস্ত প্রজা এক বাক্যে যাকে তার যোগ্য বলে মেনে নেব।

"আপাততঃ তোমাকে সে ভার নিতে হবে; কেননা, তোমার বাপ দাদা সকলেই তা নিয়েছে। ইংরাজের আইন মাথায় থাকুক, সেই আইন তার দোকানদারীর জন্যে তৈরী—তাতেই খাটে।

তুমি আমাদের এই পরগণার প্রজার জন্য এমন আইনকানুন গড়ে দাও, যা'তে কোরে দেশে এক বছর অজন্মা হ'লে রাইয়ত ভাতের অভাবে মরে না যায়। যাতে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বার মাস চলাফেরা করা যায়। যাতে কোরে, পুকুরের তরলপাঁক খেয়ে বিসূচিকায় গাঁয়ের অর্দ্ধেক লোক অকালে ম'রে না যায়। যাতে জমিদার মহাজনের পাইক পিয়াদারা প্রজার ঘরবাড়ী আর না উচ্ছন্ন করতে পারে; যাতে "মূর্খ" বলে আমাদের কলঙ্ক ঘুঁচে যায়।" আবার সমসের নীরব হইল।

জগদিন্দু আবার উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইল। কিন্তু তখনও তাঁহার দ্বিধা সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, সে বলিল,—"শুনেছি তোমরা ভোলানাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ?"

জলদ গম্ভীর তারস্বরে সমসের বলিল,—"রাজার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ হয়—ভোলানাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কি করে হবে? সে সরকারের তহশীলদার, সরকারী খাজানা প্রাপ্যগণ্ডা আমরা তাকে দিব।

বাজে জমার দাবী তার নেই, আপাততঃ বাজে জমা আমরা তোমাকে দিব, কেন না তুমিই আমাদের 'প্রধান'। তুমি বৈরাগী, তুমি ইচ্ছা কোরে আমাদের সমান অবস্থা বরণ করে নিয়েছ ; তুমিই আমাদের সুখে রাখতে পারবে।"

সকল কথা পরিস্ফুট হইয়া গেল। জগদিন্দু বুঝিল, তাঁহার সামান্য কয়দিনের পরিশ্রম বিফল হয় নাই। প্রজাদিগের উদ্দেশ্য, তাহার নেতৃত্বে সেই প্রদেশে একটা আদর্শ পল্লীসঙ্ঘ গড়িয়া তোলা, যাহাতে পরগণার প্রত্যেক প্রজার অন্নসমস্যার সমাধান হয়—স্বাস্থ্য-ঘটিত, অর্থ-ঘটিত, কৃষি, বাণিজ্য ঘটিত সর্ব্বপ্রকার উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা হয়, ঝগড়া কলহ মনোমালিন্য এবং সামাজিক সঙ্কীর্ণতা যাহাতে বিদূরিত হয়। সরল নির্লিপ্ত নিস্পৃহভাবে সে বলিল,—

"তা হ'লে আমি কি এই বুঝবো যে এই টাকার উপর ভিত্তি কোরে এই পরগণাতে একটা পল্লী-শাসন-যন্ত্র গড়ে তুলতে তোমরা আমাকে আহ্বান কর্চ্ছ ?"

সকলে সমস্বরে বলিল "হ্যাঁ !"

"বেশ, আমি মাথা পেতে তোমাদের আশীর্ব্বাদ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেম। একটা কথা মনে রেখ আমি জমীদার নই—দীন প্রজা—তোমাদের ভ্রাতৃস্থানীয়। কাজেই আমার ত্রুটি বিচ্যুতি হবে, তা তোমরা শুধ্‌রে নিও।" বলিতে বলিতে বিমল আনন্দে জগদিন্দুর গণ্ড বহিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সহজেই প্রত্যেক পল্লীতে এক একজন নেতার অধীনে এক একটি সঙ্ঘ গঠিত হইল। সকল পল্লীর কেন্দ্ররূপে জগদিন্দুর নেতৃত্বে এক

মহাসঙ্ঘ স্থাপিত হইল। অন্যান্য নিয়ম প্রণালী প্রণয়নের ভার জগদিন্দুর উপর ন্যস্ত করিয়া প্রফুল্লচিত্তে সকলে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সমসের আর্দ্র কণ্ঠে বলিল,—

"শোন ছোটবাবু! আমরা ছোটলোক, বড় গরীব—বন্যায়, বিসূচিকায়—নিরক্ষর আমরা—বছর বছর হাত পা ছেড়ে মরণের পারে চলে যাই। রাজ্যশাসকের অত্যাচার, মহাজনের উৎপীড়নে বড়ই কাতর হ'য়ে পড়েছি আমরা। তুমি আমাদের বাঁচাও—আমাদের মানুষ কোরে গড়ে তোল ছোট বাবু।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ, জগদিন্দুর পায়ের তলায় ঢলিয়া পড়িল। বিরাট সহানুভূতির দুঃখে বিগলিত হইয়া জগদিন্দু বৃদ্ধকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, সুমধুর সান্ত্বনা-বাক্যে তাহাকে আশ্বস্ত করিল! জয়ধ্বনি-সহকারে সকলে একে একে হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেল।

এক প্রান্ত হইতে অমনি ভজহরি গাহিয়া উঠিল,—

"মা কমলার অটল আসন—আছিল কোন্‌খানে?—
ধানের ক্ষেতে আমবাগানে পল্লীকুঞ্জবনে।"

নাচিতে নাচিতে শ্যামল ও দয়িতা এই মহাসঙ্গীতের প্রাণমাতান সুরে সমস্ত পল্লী মুখরিত করিয়া তুলিল! অশ্রুপ্লাবনে স্নান করিয়া ভজহরি উন্মত্ত উল্লাসে জগদিন্দুকে গাঢ় আলিঙ্গণপাশে বদ্ধ করিয়া ভাবের স্রোতে ভাসিতে লাগিল। হর্ষে, গর্ব্বে—জগদিন্দু ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে ভগবৎ করুণা ভিক্ষা করিল।

---

(৬)

শ্যাটোর কাছারি বাড়ীতে অনেক দিন আর লোক সমাগম নাই। দুই চারিজন কর্ম্মচারিব্যতীত অপর সকলেরই জবাব হইয়াছে। যাহারা আছে, তাহাদেরও কোন কাজকর্ম্ম নাই।

শ্যাটোসাহেবও বহুদিন কাছারিতে পদার্পণ করেন নাই। অর্থাভাব জনিত দুশ্চিন্তায় তিনি কাতর হইয়া পড়িয়াছেন; প্রজাদিগের ধর্ম্মঘটও বিপুল বিস্তৃতি লাভ করিয়া শ্যাটোর মস্তিষ্ক চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। এতদুভয় দুঃখ ভুলিয়া থাকিবার নিমিত্ত সপত্নিক শ্যাটো অলক্তক-বরণী সুধাকল্পা সুরাদেবীর উপাসনায় মগ্ন রহিয়াছেন।

কাছারি বাড়ীতে কর্ম্মহীন কর্ম্মচারিবৃন্দ নানাপ্রকার গল্প-গুজবে সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। আজ জনতাবিহীন কাছারিতে আড়ম্বরপূর্ণ ফাঁকা আস্ফালনে শ্রীযুত নবগোপাল সমদ্দার বেশ গুলজার করিয়া তুলিয়াছেন।

কথাপ্রসঙ্গে জনৈক কৌতুকপ্রিয় কর্ম্মচারি ধর্ম্মঘটের কথা পাড়িল। বীরত্ব-ব্যঞ্জক অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে নবগোপাল সকলকে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি এবং অনন্তদেব ভগবৎ কৃপায় সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকিলে "বেটাদের শীঘ্রই বুঝিয়ে দিবেন, যে, কত ধানে কত চাল।"

সকলে সুলভে রসিকতা উপভোগ করিবার জন্য বহুবিধ সরসবাক্য এবং মুখভঙ্গীতে সেই কথার সম্পূর্ণ পোষকতা করিল।

"তা' আর দেবেন না! আপনি হচ্ছেন কিনা গিন্নীমার আপন

মার পেটের সহোদর, অর্থাৎ কিনা দামোদর, বৃকোদর, লম্বোদর—সর্ব্বোদরের সেরা পরম পূজনীয় কুটুম্ব মহোদর। ঐ ক্ষণার বচনেই আছে না।

শ্বশুরের পুত্র যদি ভার্য্যার হন ভাই,
তাঁহাকে লিখিবে পাঠ শ্রীঅচ্যুত গোঁশাই।"

বলিতে বলিতে জনৈক যুবককর্ম্মচারি সসম্মান গাম্ভীর্য্যের সহিত শ্রীযুতের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

"তা' অবিশ্যি অর্থাৎ কিনা—দিদি বেঁচে থাকলে আমার ভাবনা কি?"

বিরাট আত্মপ্রসাদজনিত গর্ব্বের সহিত নবগোপাল বলিতে লাগিলেন।

"বুড়ো মানুষ দাওয়ান মশায়—বেচারাকে একেলা নাবালগ পেয়ে না সেই দিন এই অপমানটা করলে! আমি হ'লে দেখে নিতেম। বেটাদের গোটে গোটে চণ্ডী-মণ্ডপের দুয়ারে জবাই করব—তবে ত প্রাণের জ্বালা জুড়োবে।"

"হক্ কথা অনুমতি কোরেছেন মামা মশায়। ভাগ্যিস্ আপনার শ্রীঅঙ্গে কেউ হস্তক্ষেপ করেনি নৈলে, এতদিনে বিরাটপর্ব্ব রচে ফেলতেম না!"

"তা' যাই বল,—আমার আর সহ্য হচ্ছে না। বোনাই সাহেবও যেমন একদিনের হুমকি দেখেই কিনা একেবারে মুষড়ে গেল। বল্লেম আরো জনকয়েক দারোয়ান রেখে বেটাদের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিই, তা বোনাই সাহেব বুঝলেন না।"

আপশোষে নব-গোপালের আরক্তিম মুখমণ্ডল অকস্মাৎ ম্লান ভাব ধারণ করিল।

এই প্রকার নানাবাক্য গুঞ্জনে নববাবু নির্জ্জন কাছারি-গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন, এমন সময় মাধব গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কুলগুরু শ্রীমৎ রবিলোচন বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় এক হাঁটু কাদা আর গালভরা হাসি লইয়া ক্লান্ত অবসন্ন দেহে তথায় প্রবেশ করিলেন।

বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি হস্তস্থিত "নবাব জান" মার্কাক্যান্‌ভাস ব্যাগ এবং তৎসহ পট্টরজ্জু বদ্ধ থেলোহুকা, কলকে, প্রভৃতি ফরাশের উপর রাখিয়া ছাতার বাটে জড়ান জীর্ণ মলিন গামছাখানি খুলিয়া গাত্র প্রবাহিত ঘর্ম্ম প্রবাহ মুছিতে মুছিতে শ্যাটো-সাহেবের খাস ব্যবহারের আরাম চৌকিখানা অধিকার করিয়া বসিলেন।

এবম্প্রকার অনধিকার কার্য্যে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতজন-সুলভ অপরিমার্জ্জিত স্বাধীন ব্যবহারে নবগোপাল বাবু ভিতরে ভিতরে একটু উষ্ণ হইয়া উঠিলেন।

ক্ষণপরে নবগোপালকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "একটু তামাকের বন্দোবস্ত করত বাপু।"

এতগুলি নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারির সাক্ষাতে স্বয়ং শ্যাটো-শ্যালকের প্রতি ইত্যাকার হীনকার্য্যের আদেশে মহিমার্ণব মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাই স্বাভাবিক, তাই তিনি অত্যন্ত অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন।

"কে হে তুমি জঙ্গলি জানোয়ার! যাকে, তাকে যা' ইচ্ছে তাই বলছ?"

শাস্ত্রী মহাশয় এতৎ প্রদেশের একজন সুশিক্ষিত অধ্যাপক। কোনও সিদ্ধমহাপুরুষের বংশধর তিনি। বিশেষতঃ, স্বর্গীয় কর্ত্তার আমলে এই পরিবারের উপর তাঁহার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। হালে শ্যাটোর ম্লেচ্ছাচারহেতু তিনি প্রায় দশ বৎসর এই বাড়ীতে পদার্পণ করেন নাই। সম্প্রতি শান্তিময়ী দেবীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে স্বয়ং—শিষ্য পরিবারের মঙ্গল কামনায় শান্তিস্বস্ত্যয়ণ করিতে সম্মত হইয়া শিষ্যগৃহে আগমন করিয়াছেন।

অর্ব্বাচীন নবগোপালের অভদ্রোচিত বাক্যে শাস্ত্রীমহাশয় নিরতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। সাধারণতঃ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যেমন হইয়া থাকেন—শাস্ত্রী মহাশয়ও সংসারীর হিসাবে তেমনই একটু স্থূলবুদ্ধির লোক, তাঁহার মেজাজটিও অপেক্ষাকৃত অল্পকারণেই উগ্রতা পরিগ্রহ করিয়া থাকে। ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণ তাই বলিলেন, "দূর হও মূর্খ!"

এত বড় অপমান সহ্য করিবার পাত্র নবগোপাল নহেন। সহ্য করিলেও তাঁহার সমুচ্চ পদগৌরব সহসা ক্ষুণ্ণ হইবার নিশ্চিত আশঙ্কা বিদ্যমান। অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া তাই তিনি সক্রোধে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণের গ্রীবাদেশে হস্তার্পণ করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না।

হীন অপমানে জ্ঞানহারা শাস্ত্রী মহাশয় দারুণ অভিমানে এবং নষ্ট-মর্য্যাদার বিষম ব্যথায় অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—উত্তরীয়, ব্যাগ, হুকা, কলিকা, ছত্র, পাদুকাদি ঝটিতি গ্রহণ করতঃ, ভুঁড়ী প্রদেশের স্খলিত বসন ও ভূমি গাত্র মার্জ্জনশীল অঞ্চল-

কচ্ছ কোন প্রকারে আয়ত্বাধীন রাখিয়া জ্ঞানহারা অধ্যাপক অগ্নিমূর্ত্তিতে একেবারে প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইলেন।

এই ঘটনা ঘটিতে অতি অল্পমাত্র সময় লাগিল। আমলাবর্গের মধ্যে মাত্র একজন অতি বৃদ্ধ কর্ম্মচারী ছিলেন, যিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে চিনিতেন। মুখোপাধ্যায় পরিবারের উপর এই প্রবীণ ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির কথাও তিনি অবগত ছিলেন।

ব্যাপার দেখিয়া প্রথমে বৃদ্ধ বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। ক্ষণপরে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়া প্রাঙ্গণকেন্দ্রে উলঙ্গপ্রায় অর্দ্ধোন্মত্ত বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া, বৃদ্ধ তাঁহাকে ক্রোধ সম্বরণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

জ্বলন্ত অনলে ঘৃত প্রক্ষেপের মত ইহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের ক্রোধাগ্নি দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। জবাকুসুম-সন্নিভ লোচনদ্বয় হস্ত-পৃষ্ঠদ্বারা পেষণ করিতে করিতে তিনি ভোলানাথের উৎসন্ন গমনের ব্যবস্থা দিলেন।

তখনও নবগোপালের ক্রোধের উপসম হয় নাই। ভোলানাথের অগোচরে তৎপ্রতি অভিসম্পাত বর্ষণে, নেমকহালাল আত্মীয়বরের কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হইল।

কবি বলিয়াছেন 'তপণের তেজ মস্তকে ধারণ করা যায়—কিন্তু তপণ-তাপ-তপ্ত বালুকার উত্তাপ পদতলেও সহ্য হয় না।' তাই ভোলানাথের শক্তি-মদিরান্ধ আশ্রিত কুটুম্বের মস্তিষ্কে অসহ্য তেজের সঞ্চার হইল।

বৃদ্ধের মার্জ্জনাভিক্ষা ও মিনতিবাক্য নবগোপাল—ব্রাহ্মণ্যশাসিত

শূদ্রাদি ইতর জাতীয়ের দুর্ব্বলতা বলিয়াই ধরিয়া লইলেন। শ্যাটোর সহিত এই অপমানিত ব্রাহ্মণের যে সাধারণ ব্রাহ্মণপণ্ডিত অপেক্ষা অপর কোনও উচ্চতর সম্মান-সম্বন্ধও থাকিতে পারে, সে কথা কৈতবাদকুশল মূর্খ নবগোপালের মস্তকে প্রবেশ করিল না। ক্রোধান্ধভাবে সে বার বার ব্রাহ্মণকে স্তব্ধ হইতে বলিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ও নিদারুণ লাঞ্ছনা, অপমানে সম্পূর্ণ লুপ্তচৈতন্য হইয়াছিলেন। তিনি নবগোপালের কথায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, পুনঃ পুনঃ ভোলানাথের উদ্দেশে অভিসম্পাত-অনল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে নিয়তি-কর-রজ্জু-পরিচালিত ব্রাহ্মণ, নবগোপালের প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া শ্যাটোভবন পরিত্যাগ করিলেন। নবগোপালের সহিত সমুচ্চ বাক্‌বিতণ্ডা-পরায়ণ বৃদ্ধের চীৎকারে অন্দর মধ্যে এই অমঙ্গল-বার্ত্তা বিঘোষিত হইল।

স্বতঃই শান্তিময়ীর মনে একটা অমঙ্গল-আশঙ্কা জাগরিত ছিল; তাই বৃদ্ধের আকস্মিক চীৎকারে তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন।

পরে, গুরুদেবের লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া তিনি সদ্যমৃত-পুত্র-শোকাতুরা জননীর ন্যায়, গগনভেদী আকুল আর্ত্তনাদে গৃহ-বিগ্রহের চরণ-প্রান্তে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

মদিরা-পান-বিহ্বল শ্যাটোদম্পতির কাণে এই ব্যাপারের কোন কথাই পৌছিল না।

---

(৭)

অন্দরস্থিত পুকুরের পাড়ে মার্বেল বাঁধান ঘাটের কোণে বসিয়া শ্যাটো দুর্ভাবনার হাত এড়াইবার জন্য ঢোক্ ঢোক্ দ্রাক্ষারিষ্ট গলাধঃকরণ করিতেছিল।

এমনি অদৃষ্ট তাঁহার—যেই বিলাতি মহৌষধের এক আধ মাত্রা পেটে পড়িলে, পথের ভিখারীর প্রাণেও রাজহস্তী ক্রয় করিবার আহ্লাদ জাগিয়া উঠে, সেই অমোঘ অরিষ্ট বোতলশুদ্ধ পান করিয়াও শ্যাটোর অন্তরের অন্ধকার তিরোহিত হইল না—দুর্ব্বল মস্তিষ্কে সুরাদেবীর প্রবল প্রভাব বিস্তৃত হইয়া বরং তাহার আঁধার প্রাণের তমোরাশি উত্তরোত্তর ঘনীভূত করিয়া দিল।

দল বাঁধিয়া সমস্ত জমিদারীর প্রজাগণ খাজনা বন্ধ করিয়াছে। অনন্তদেবের সুপরামর্শে অনেকের নামে মোকদ্দামা করিয়া আদালতের ডিক্রীও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কোনও সুফল হয় নাই।

প্রথমতঃ—ন্যায্যপ্রাপ্য খাজনা ব্যতীত সুদীর্ঘ বাজেজমার ফর্দ্দ আদালতে গ্রাহ্য হয় না। অথচ, বাজেজমা ব্যতীত সুধুমাত্র ন্যায্য খাজানা গ্রহণ করিতে হইলে জমিদারীর আয়ের তিন ভাগই কমিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ—সামান্য টাকার মোকদ্দমায়, দাবীর অপেক্ষা বেশী খরচ পড়িয়া যায়—আদালতের মাশুল, উকিল মুহুরীর সেলামী, আমলাগণের দস্তুরী, পিয়াদার ভালমানুষী—তদ্বির খরচ ইত্যাকার

অনন্ত প্রকারে গাঁটের কড়ি দেড়গুণ খরচ করিলে তবে একগুণ টাকার ডিক্রী পাওয়া যায়।

তদুপরি আর এক নূতন বিপদ এই যে—এত করিয়া ডিক্রী-জারিতে প্রজার মালক্রোক করিলেও তাহার নিলাম ডাকিবার লোক পাওয়া যায় না। এমন কি, কেহ পাঁচগুণ পারিশ্রমিক পাইলেও ঐ সমস্ত মাল আদালতে পৌঁছাইয়া দিতে সম্মত হয় না।

এবম্প্রকার ব্যর্থ মোকদ্দামা করিয়া কোনও লাভ হয় নাই। আদালতের সহিমোহরযুক্ত মূল্যবান "ফয়সলা" গুলি দপ্তরের আলমারীতে পোকার আহার জোগাইতেছে মাত্র।

ইতিমধ্যে "ননকো" নামধেয় ভয়ঙ্কর ব্রহ্মদৈত্যের দোহাই দিয়া, শ্রীযুত শ্যাটো সদরে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এমনি প্রবল গ্রহের প্রকোপ—এমন অব্যর্থ মন্ত্র পর্য্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নাই।

পিটুনি পুলিশ পাঠাইয়া শান্তিপ্রিয় প্রজাবর্গের মধ্যে অশান্তি আনয়ন করিতে সেই জেলার নবাগত শ্বেতাঙ্গপুঙ্গব রাজি হন নাই। অধিকন্তু প্রজার কাছে মার্জ্জনা চাহিয়া গোলযোগ মিটমাট্ করিবার অসঙ্গত পরামর্শ দিয়া তিনি শ্যাটোকে বিদায় করিয়াছেন।

বিশাল জমিদারীর একচ্ছত্র অধিপতি শ্যাটোসাহেব তাই একটা বিরাট দুর্ভাবনায় প্রতিদিন ঘনান্ধকারে নিমজ্জমান হইয়া পড়িতেছে।

তহবিলে যৎসামান্য নগদ অর্থও আর নাই; নিজের জমিদারীর অংশ দুইবার বন্ধক দেওয়া হইয়া গিয়াছে—তৃতীয়বার আর কেহ উহা বাঁধা রাখিতেও চাহে না।

গৃহিণীর স্বল্পালঙ্কারের অবশিষ্ট দুই চারি খানা বাঁধা দিয়া আশ্বিনের কিস্তী সদর খাজানা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু পথকর দেওয়া হয় নাই বলিয়া প্রায় প্রতিদিন দুই চারি খানা কালেক্‌টারির অস্থাবরক্রোক্‌ সার্টিফিকেট আসিতেছে, কোনও প্রকারেই আর জমিদার পরিবারের সম্মান রক্ষা হইবার উপায় নাই।

শ্যাটো এবং পারুলের মিলিত রূক্ষ ব্যবহারে, শান্তিময়ী আর তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করেন না। নচেৎ তাঁহার হাতে এখনও বহুপরিমাণ নগদ অর্থ এবং প্রাচীন পরিবারের যাবতীয় মূল্যবান আসবাব, অলঙ্কারাদি রহিয়াছে। দারুণ অভিমানী শ্যাটো অপর কাহারও দ্বারায়ও মাসীমার সাহায্যভিক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পারে নাই।

নিত্য খুঁটি নাটি কথায় পারুল এবং শ্যাটোর মধ্যেও অযথা দাম্পত্যকলহের সূচনা হইয়াছে। এতাদৃশ সর্ব্বপ্রকার গ্রহবৈগুণ্যের ফলে, শ্যাটো মৌনাবলম্বন করিয়া সর্ব্ব দুঃখনাশিনী সুরাদেবীর তরল করুণা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে—কিন্তু প্রফুল্লতার পরিবর্ত্তে তাহাতে তাহার মন ক্রমশঃ ঘোরতর কালিমাচ্ছন্ন এবং দেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

অনেকক্ষণ ব্যর্থ 'কারণ-সাধনায়' মগ্ন থাকিয়া শ্যাটো বিষম ভাবনা-জলধির অতলতলে নিমজ্জিত হইয়া পড়িল।

এমন সময় শ্যামল একটি ফড়িঙের পশ্চাতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সেখানে আসিয়া ক্ষুদ্র ফড়িঙটি ধরিয়া ফেলিল—পশ্চাতে দয়িতা ছুটিয়া আসিয়া অমনি তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

"ছেড়ে দাও, মাথা খাবে—ওর ডানা ছিঁড়ে ওকে কষ্ট দিওনা ভাই।" বলিতে বলিতে বালিকা সত্যই চক্ষের জল মুছিল।

"ধরেছি ত' ছাড়বো কেন—হুঁ!" বলিয়া শ্যামল দয়িতার হাত ছাড়াইয়া ফড়িঙ্ লইয়া দৌড়াইবার চেষ্টা করিল।

কষ্টে শ্যামলের হাত আরও জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়া দয়িতা নানাপ্রকারে শ্যামলকে বুঝাইয়া দিল যে—"ডানা ভাঙ্গিয়া দিলে সত্যই ফড়িঙটি ব্যথা পায়—মানুষ বলবান বলিয়া, ক্ষুদ্র ফড়িঙ্এর প্রতি অত্যাচার করিলে স্বর্গের দেবতারা রাগ করেন।"

বালিকার সরলতার সকরুণ প্রার্থনা ব্যর্থ হইল না। প্রবুদ্ধ বালক নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিবার বিরাট ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া—খেলার সাথীর মান রক্ষা করিল।

অমনি হর্ষোৎফুল্ল বালকবালিকা উভয়ে উভয়ের বাহুবন্ধনে বদ্ধ হইয়া অন্যবিধ খেলার সন্ধানে চলিল।

এতক্ষণ বিমুগ্ধচিত্তে শ্যাটো বালক বালিকার এই ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগের মধ্যে একটা মহৎ দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছিল। শিশুদ্বয়কে চলিয়া যাইতে দেখিয়া—সে তাহাদের ডাকিল।

শ্যাটো যে সেইখানে ছিল, একথা দয়িতা বা শ্যামল কেহ তখনও জানিতনা। চমকিত শিশুযুগল, ভয়ে বিস্ময়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আবার শ্যাটো তাহাদের আহ্বান করিল।

"যাস্নি দয়ি—বাবা কি খাচ্ছে দ্যাখ; কাছে গেলে তোকেও খাইয়ে দেবে—তখন টের পাবি কেমন মজা।" বলিয়া শ্যামল দয়িতাকে বারণ করিল। দয়িতা কিন্তু তাহার কথা শুনিল না।

সোল্লাসে দৌড়াইয়া গিয়া সে একেবারে 'জ্যেঠামশায়ের' কোলে ঝাঁপিয়া বসিল।

ক্ষুদ্র, কোমল বাহুলতার বাঁধনে শ্যাটোর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া দয়িতা বাঁশরীর সুরে বলিল,—"তুমি সরবৎ খাচ্ছ?"

সরলা বালিকার প্রশ্নে কি জানি কেন শ্যাটো একটু অনুতপ্ত হৃদয়ে উত্তর করিল,—"না মা—বিষ খাচ্ছি।"

বালিকা বুঝিল না—মানুষে কেন বিষ খাইবে! তাই সে বলিল,—"ছি, বিষ কি খেতে আছে? মরে যাবে যে!" বলিয়া শ্যাটোর হাত হইতে পানপাত্র কাড়িয়া লইল।

"মরেই ত আছি মা—আর মরব কি?" বলিয়া শ্যাটো আবার ভাবনার জলে ভাসিয়া চলিল। দয়িতা অত কথা বুঝিল না। মানুষে আবার বিষ খাইয়া মরিবে কেন তাহা সে জানে না।

"না জ্যাঠামশায়, বিষ খাবে কেন? আমি তোমাকে বিষ খেতে দেব না। আমার বাবা ত বিষ খান না।" বলিয়া বালিকা— সকাতর প্রার্থনার আর্দ্র দৃষ্টিতে শ্যাটোর দিকে চাহিল।

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া শ্যাটো বলিল,—"না মা তোমার বাবা যে মানুষ, আমার মত জানোয়ার নন—যে বিষ খাবেন। বরং এই বিষ যারা খায়, তাদের ছুঁলে তিনি স্নান করে শুদ্ধ হয়ে আসেন।"

"তা হ'লে তুমিও খেয়ো না; তুমি ত বাবারও বড়—যা খেতে নেই, তা খাবে কেন? এই ঢেলে ফেলে দিই।" বলিয়া বালিকা কথা মত কার্য্য করিবার সাহসের অভাব বশতঃ শ্যাটোর সম্মতির অপেক্ষায় তাঁহার প্রতি অকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

শ্যাটো এই ক্ষুদ্র বালিকার সকাতর প্রার্থনাবাক্যের মধ্যে ভগবৎ প্রেরণার ছায়া দেখিতে পাইল। নীরবে সে সেই কথা ভাবিতে লাগিল।

শ্যাটোকে নীরব দেখিয়া দয়িতা আবার বলিল—"ফেলে দি?" শ্যাটো কোনও উত্তর দিল না। সাহস পাইয়া বালিকা "এই ঢেলে ফেল্লেম।" বলিয়া ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া সত্যই সেই দ্রবীভূত হলাহল ঘাটের উপর ঢালিয়া ফেলিল। সাফল্যের আত্মপ্রসাদ-জনিত হর্ষোৎফুল্ল বালিকা বারম্বার শ্যাটোর গণ্ডে স্নেহ চুম্বন করিতে করিতে বলিল,—

"বল আর এ খাবে না?"

"বলতে পারি না মা। মনটা একটু বশে আছে এখন,—আবার কখন বিগড়ে যাবে কে জানে?" বলিয়া আজি জীবনের প্রথম শ্যাটো শত্রুকন্যাকে অনাবিল স্নেহে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

এমন সময় ভজহরি—

> আমি পাগল, কি মনটা পাগল—না পাই ঠিকানা—
> সাত পাগলে পাগল করলে, কেউ ত বোঝেনা॥

গাহিতে গাহিতে একটা বিহ্বল উন্মাদনার সঙ্গীত তরঙ্গ লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

দয়িতা এবং শ্যামল উভয়েই ভজহরিকে পাগল বলিয়া বড় ভয় করিত—তাহাকে দেখিয়াই তাহারা কাহারও বাধা না মানিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

একমনে শ্যাটো ভজহরির উন্মাদ সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে আত্মহারা

হইয়া পড়িল। ঘনীভূত সুরসুধা আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে, পুষ্প-কাননে, প্রান্তরে বনে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া এমন একটা আকুল উন্মাদনার সৃষ্টি করিল, যে সুরা-বিহ্বল শ্যাটো একাগ্র মনঃসংযোগে সেই সুধার সমুদ্রে ডুবিয়া রহিল।

শরতের স্নিগ্ধ সুনীল আকাশের পশ্চিম প্রান্তে বসন্তের ফাগ্ ছড়াইয়া তখন তিরোহিততেজঃ সন্ধ্যার সূর্য্য, ক্লান্ত অবসন্ন দেহভার নৈশ নিদ্রার কোলে ঢালিয়া দিতে চলিয়াছিলেন। মৃদু মলয়-হিল্লোলিত দীর্ঘিকার জলে সেই রক্তিম আভা পড়িয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্যপটের সৃজন করিয়াছিল—আর মলয়ের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পদ্মপরিমল সেই সঙ্গীত-ঝঙ্কার-কুহরিত রঙ্গমঞ্চের আবেশ-বিহ্বল ভাবসমষ্টির মধ্যে পূর্ণতা আনিয়া দিতে ছিল।

গান শেষ হইল—কিন্তু তখনও গায়ক এবং শ্রোতা উভয়েই সেই সঙ্গীতসৃষ্ট দিব্য মূর্চ্ছনায় বিভোর। অবশেষে চমক ভাঙ্গিলে শ্যাটো বলিল—"ভজু—তুমি কি সত্যই পাগল?"

"নিছক্" বলিয়া ভজহরি হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"তুমি কবে এলে ভজু?"

"অনেক দিন এসেছি বাবা—জমিদার মানুষ, বিষয় লয়ে ব্যস্ত ছিলে কিনা—তাই চোখে পড়ে নি।" বলিয়া ভজহরি স্বীয়

পাঠিয়ে দেবে বাবা ? না, না—সে যায়গাটা বড় নোংড়া। বারণ করো, আর তোমার পুকুরধারে আসব না বাবা।' বলিতে বলিতে ভজহরি দ্বিতীয়বার প্রস্থানের উদ্যোগ করিল।

"না—না ভজহরি, আর পাঠাব না তোমায়। তুমি ত পাগল নও, পাগলের গানে—পাগলের প্রাণে এমন মত্ততা আন্‌তে পারেনা।" বলিয়া শ্যাটো ভজহরির হাত ধরিল। ভজহরির আপাদমস্তক তখন ভয়ে, বিস্ময়ে কিংবা হর্ষে—যে কারণেই হ'ক—থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

"না—আমায় ধরোনা বাবা, আমি সত্যি পাগল। নেশা ভ্যাং করিনে বাবা, যে তার দোহাই দিয়ে বলবো 'আমি পাগল নই।' জমিদারী নেই, যে সেই অছিলা কোরে পাগলামী ঢেকে রাখবো! স্বদেশ প্রেম নেই যে—বঙ্গমাতার কাঁদুনী কেঁদে বলবো 'আমি পাগল নই।' আমি সত্যি একটা পাগল বাবা!" ভজহরি ভীমবলে শ্যাটোর ক্ষীণ হস্তের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দাঁড়াইল।

"না, না, তুমি পাগল নও—তুমি বিশ্বপ্রেমিক—তুমি মহাপুরুষ—তুমি পাগলামীর আবরণে সভ্য পাগলদের জ্ঞানবিধাতা! তুমি—"

শ্যাটোর কথায় বাধা দিয়া ভজহরি বলিল "আমি সব পাগলের গুঁছা—একটা নিঃস্ব, ভণ্ড, বদ্ধপাগল—" অমনি সে কোনও প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই দ্রুত প্রস্থান করিল।

দূরে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া সান্ধ্য শঙ্খনাদের সঙ্গে তাহার সঙ্গীতের শেষ রেশ্ মিলাইয়া গেল,—**"এই কুটিল দুনিয়ায় —সেইত স্বাধীন, রাত্রিদিন যাঁর—শিকল বাঁধা পায়।"**

অনেকক্ষণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া পারুল—শ্যাটো এবং ভজহরির উন্মত্ততার অভিনয় দেখিতে দেখিতে বিরক্তির হাসি হাসিতে ছিল। ভজহরি চলিয়া গেলে শ্যাটোর কাছে আসিয়া সে বলিল,—"এমন ক'রে পাগলামীর অভিনয় আর কতকাল চলবে ?"

তখনও শ্যাটো সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া আপনার মানসিক দৈন্যের অবস্থার সহিত—স্বাধীন, উন্মাদ ভজহরির অবস্থার তুলনা করিয়া গাঢ় চিন্তায় মগ্ন ছিল। অন্যমনস্কে সে বলিল—"হুঁ !"

পারুলের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। খৃষ্টীয় মিশনারী সংসর্গে 'আদান-প্রদান' মূলক আদর্শে গঠিত তার জীবন। কখনও কল্পিত উচ্চ ভাবের আবেগ তাহার মস্তিষ্কস্পর্শ করিতে পারে নাই। জীবনটাকে পূর্ণ উপভোগ্য করে নেওয়াই তাহার জীবন ধারণের উদ্দেশ্য।

উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেই তাহার শান্তি, স্বার্থসিদ্ধিই তাঁহার আদর্শ। হীন সঙ্গলিপ্সাই তাঁহার দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য।

পরার্থপরতা, সমব্যথা, প্রেম, প্রণয়, সদসৎ-বিচার-বিধি তাঁহার মানসঅভিধানের বহির্ভূত অর্থহীন মিথ্যা পদমাত্র! শ্যাটোর মত দুশ্চিন্তায় বিমর্ষ হইবার মেজাজ তাহার নয়! শ্যাটোর কাতরতা দেখিয়া সমবেদনায় গলিয়া যাইবার মত শিক্ষাও সে পায় নাই। তাহার অন্যমনস্ক, অসম্বদ্ধ উত্তরে তাই ক্রোধভরে পারুল বলিল,—

"গলায় দড়ি জোটেনা ? সামান্য বিপদে এমন ক'রে মুষড়ে যাও—আবার মানুষ বলে গর্ব্ব কর ? ছি, ছি, ছি !"

সুতীক্ষ্ণ বাক্য-বিদ্ধ হইয়া শ্যাটো প্রকৃতিস্থ হইল। অনেক কাতর অনুনয়ে সে পারুলের করুণা ভিক্ষা করিয়া বিফল মনোরথ হইল।

দুশ্চিন্তায় তাহার স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষ স্বভাব অধিকতর চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে কথায় কথায় সে পারুলকে স্পষ্ট করিয়া বলিল যে, তাহার সংসর্গ আর তাহার ভাল লাগে না, তাহার পরামর্শে যতদূর সম্ভব অধঃপতনের পথে সে নামিয়াছে—আর পারুলের পরামর্শে তাহার প্রয়োজন নাই।"

পদদলিতা বিষধরীর তেজে জ্বলিয়া উঠিয়া পারুল নানা তীব্র বাক্যে বেচারী খ্যাটোর ভাবনাবিব্রত অন্তর বিদ্ধ করিতে গাগিল। ক্ষোভে, অভিমানে, অনুশোচনায় খ্যাটো ম্রিয়মান হইয়া পড়িল।

সুযোগ পাইয়া পারুল পুনরায় অশেষ প্রকার তিরস্কারবাক্যে খ্যাটোকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল।

এমন সময়—সমস্ত দিন অস্নাতা, উপবাসিনী শান্তিময়ী কম্পিত-পদে সেখানে আসিলেন। তখনও বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাঁহার সমস্ত অবয়ব ঘন কম্পিত হইতে ছিল। তাঁহার নয়ন সরসীর দুকূল ছাপিয়া তখনও অশ্রুপ্রবাহ বহিতেছিল।

অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিলেন,—"ভুলো, আমার পিতৃভিটায় এই অত্যাচার আর আমি সহ্য করতে পারি না—আমার একটা বিহিত করে দে।"

খ্যাটো কিছুই বুঝিতে পারিল না। বধূর প্রতি মাসীমাতার আন্তরিক বিরক্তির কথা সে অবগত ছিল, তাই বলিল,—

"সবই বুঝি মাসীমা। কিন্তু ঘরের পাগল রাস্তায় ছেড়ে দিলে, তাতে আরও বেশী লোকাপবাদেরই আশঙ্কা।"

মাসী মা কিন্তু বুঝিলেন না যে, নবগোপাল তাহার পিতৃপরিবার

মধ্যে কেমন করিয়া "ঘরের পাগল"রূপে পরিগণিত হইতে পারে! তাই তাঁহার প্রাণের দুঃখ আবার উথলিয়া উঠিল,—

"তোদের ঘরের পাগল নিয়ে থাক তোরা ভুলো, বুড়ো থুবড়ো হ'য়েছি আমি, আমায় বিদায় দে।" বলিতে বলিতে শান্তিময়ী শ্যাটোর দিকে বিহ্বলভাবে চাহিয়া রহিলেন।

"বোনপো'র কাছে নাকে কেঁদে আদর কারাতে এসেছেন।" বলিয়া পারুল অবজ্ঞাব্যঞ্জক ভঙ্গীতে নাসিকাকুঞ্চন করিল।

"ছি পারুল, মাসীমার মুখের উপর তোমার কথা কওয়া সাজে না—তুমি জান না মাসীমা আমার কে?"

বলিয়া শ্যাটো এমন একটা করুণ-প্রার্থনাপূর্ণ ভঙ্গীতে পারুলের দিকে চাহিল, যাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, মাসীমার করুণাই তাহার শেষ অবলম্বন—পারুল যেন অসংযত কথার আঘাতে তার সেই অবলম্বনটি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া না দেয়।

পারুল অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতির লোক। অপ্রিয়বাদিনী সে, কুৎসিতভাষিণী সে—কিন্তু তাঁহার অন্তরে কূটনীতির ছায়ামাত্রও নাই। খোশামোদ ব্যাপারটাই তাহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, তাই শ্যাটোর কথায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া সে কহিল,—

"আমি অত শত বুঝি না—উনি যেন আমার কাছে অমন ক'রে নাকে কাঁদতে আসেন না—তা বলে দিচ্ছি।"

বিরাট মনোবেদনার উপর আবার পারুলের সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জ্জরিতা হইয়া শান্তিময়ী বলিলেন,—

"ঠিকই বলেছিস বউ। আমরা সেকেলে সাদাসিধে মানুষ।

তোদের হাল ফ্যাসানের চালচলন আমরা জানি না ত'। তাই বলছি, আমাকে বিদেয় করে দে; তোরা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার কর্। ভুলো! আমার পুত্র নেই, তুইই আমার সব। তাই, তোকে একটা অখণ্ড রাজত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেম—তুই সুখী হলেই আমার সুখ, তাই দিয়েছিলেম। হিন্দুর আচার লোপ করে, যথেচ্ছা দুইজনে লক্ষ্মীর পীঠে অনাচারের সৃষ্টি করেছিস্, তাতেও কোনও কথা কইনি। কিন্তু আজ—ওহো হো—"

আর বলিতে পারিলেন না। একটা প্রবল আবেগে শান্তিময়ীর কণ্ঠরোধ হইল।

সহসা শ্যাটোর জ্ঞান সঞ্চার হইল। ক্রন্দনশীলা শান্তিময়ীর রুক্ষ বদন, শীর্ণ দেহবল্লরী এবং অবিরত ক্রন্দনহেতু স্ফীত চক্ষুপল্লব দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

শ্যাটো, সঙ্গ ও শিক্ষা দোষে অনেক প্রকার দোষের আকর হইয়া পড়িয়াছে। শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া দাক্ষিণ্যাদি কিছুই সে জানে না, বা বোঝে না। কূট স্বার্থচিন্তা তাহার জীবনের সার ব্রত।

তথাপি অত্যন্ত প্রখর তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি। সে জানিত মাসীমার অনুকম্পা ব্যতীত তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের কোনও আশা নাই। শ্যামলের প্রতি শান্তিময়ীর প্রগাঢ় ভালবাসার কথাও সে অবগত ছিল। তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, অতিরিক্ত দুর্ব্যবহার না করিলে অন্ততঃ শ্যামলের হিতের জন্য হ'লেও, মাসীমা তাহার সহায়তা করিবেন। কল্পিত স্নেহার্দ্রস্বরে সে বলিল,—

"কি হয়েছে মাসীমা? চেহারা দেখে বুঝছি, তুমি সারাদিন

স্নান আহার কিছুই করনি, বুঝি কেবল কেঁদেই কাটিয়েছ—কি হয়েছে মাসীমা ?"

"কি আর হবে, তোমার মাসীমার পিণ্ডি বুঝি শেয়ালে চটকে গেছে।"

বলিয়া নির্লজ্জা পারুল পৈশাচিক হাসির তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দিল।

"ছি, ছি, পারুল! তুমি না ভদ্রবংশে জন্মেছিলে? ছি ছি!"

বলিয়া বিষম লজ্জায় শ্যাটো নীরব ইঙ্গিতে মাসীমার মার্জ্জনা প্রার্থনা করিল।

"তুমি বুঝবে না বৌমা! কত সোহাগে, কতবড় আশায় তোমাকে ভোলার সঙ্গে বরণ কোরে এই ঘরে এনেছিলেম! যাক্, আমার সবই গেছে। বাকি ছিল কেবল তোমার ভাইয়ের হাতে গুরুদেবের লাঞ্ছনা, তাও আজ—"

আবার শান্তিময়ীর কণ্ঠরোধ হইল, কথা শেষ না হইতেই তিনি নীরব হইলেন।

শ্যাটো, আচারভ্রষ্ট কদাচারলীন হইলেও তাঁহার হিন্দু জনোচিত দুই একটা দুর্ব্বলতা ছিল। সে জানিত যে, শান্তি স্বস্ত্যয়নের জন্য বহুদিন পরে তাহার মাতামহের কুলগুরুদেবের আসিবার কথা আছে। তাই শান্তিময়ীর কথা শুনিয়া সে বলিল,—

"সে কি মাসী মা! ঠাকুর মশায় এসেছিলেন?"

"এসেছিলেন, এসে ধুলো পায়ে তোর শ্যালার হাতে উত্তম মধ্যম আহার কোরে, তোকে আশীর্ব্বাদ করে ফিরে গেছেন ভুলো।"

শুনিয়া পারুল একবার তীব্র প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু শ্যাটো তখন ক্রোধোন্মাদ। বিষম চীৎকারে সহধর্ম্মিণীর প্রাণে প্রবল ভীতির উদ্রেক করিয়া দিয়া সে তারস্বরে ভৃত্যকে ডাকিল। তৎপর ভৃত্যের দ্বারায় নবগোপালকে তখনি ডাকিয়া পাঠাইয়া সে নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল।

আর যাহাই হউক হিন্দু সে। একটা বৃহৎ ক্রিয়াকর্ম্মপরায়ণ জমিদার বংশের সুখ্যাতি সুনাম রক্ষার ভার তাহারই উপর ন্যস্ত। দুঃসময়ের সহচর নানা কুসংস্কারের ক্রীতদাস সে। তাহার গৃহ হইতে সর্ব্বজনপূজ্য গুরুদেব অপমানিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, এই দারুণ মনস্তুঃখে তাই শ্যাটোর অবয়বে তখন একটা হিংস্রজন্তুর মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষে বিষম আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে—প্রবল অশ্রু প্লাবনেও সেই অনল নির্ব্বাপিত হইল না।

ক্ষণপরে নবগোপাল ভগিনী-ভগিনীপতি প্রভৃতির চিরস্নিগ্ধ সামীপ্যে উপস্থিত হইয়া শ্যাটোর উগ্র ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইয়া গেল। মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রচারশীল বিচারকের স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে শ্যাটো বলিল,—

"আজ এই দণ্ডে আমার বাড়ী হইতে দূর হও জানোয়ার!" সুদৃঢ় অনুজ্ঞার স্বরে এমন একটা তীব্রতা ছিল, যাহাতে নবগোপাল মনে মনে প্রমাদ গণিল।

"কোথায় যাব বোনাই সাহেব? আমার যাবার আর স্থান আছে কোথায়?" বলিতে বলিতে শিশুর অধম উপায়হীনভাবে দাম্ভিক মূর্খ কাঁদিয়া ফেলিল।

"গোল্লায় যাও তুমি—মোদ্দা আমার বাড়ী আর তোমার স্থান হবে না। একটি কথাও ক'ও না—কইলে অনর্থ হবে জেন।"

শ্যাটো অবিচলভাবে এই কয়টি কথা বলিয়া মুখ ফিরাইল। নবগোপাল তজ্জাতীয়ের স্বভাবসিদ্ধ অনেক অনুনয়, বিনয়, ক্রন্দন, বিলাপ করিল। কিন্তু, কিছুতেই কোন ফল হইল না। অবশেষে বিষম বিরক্তিসহকারে শ্যাটো নবগোপালের শ্রীঅঙ্গে হস্তার্পণের উদ্যোগ করিল।

এতক্ষণ পারুল নীরবে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। সহসা শ্যাটো এবং নবগোপালের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া সে বলিল—"আমি জান্‌তে চাই, এই গৃহে আমার স্থান আছে কি না?"

"তোমাকে কেউ কোথাও যেতে বলে নি!" বলিয়া বিজাতীয় ঘৃণার সহিত শ্যাটো গৃহিণীর পানে চাহিল।

"তা হ'লে এও কোথাও যাবে না।" প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা মাত্র না করিয়া শ্যাটোভামিনী ভ্রাতার হস্ত আকর্ষণকরতঃ সেই স্থান ত্যাগ করিল।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া শ্যাটো মাসীমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার মার্জ্জনাভিক্ষা করিল। স্নেহের প্রাবল্যে দুঃখ অভিমান ভুলিয়া, শান্তিময়ী পুত্রতুল্য ভোলানাথকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন—তাহার মস্তক, অজস্র স্নেহাশ্রু বর্ষণে ভিজাইয়া দিলেন।

---

(৮)

মিয়াদগঞ্জ পরগণায় জগদিন্দুর নেতৃত্বে এবং প্রজাবর্গের মিলিত চেষ্টায় প্রতি গ্রামে পল্লীসংঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক পল্লীতে একজন নির্ব্বাচিত অধিনায়কের অধীনে তিনজন সভ্যের উপর সেই সেই পল্লীসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে। এই সমস্ত সঙ্ঘের অধিনায়কগণ জগদিন্দুর নেতৃত্বাধীনে মহাসঙ্ঘের সভ্যরূপে কাজ করিতে লাগিল।

ছোট বড় প্রত্যেক চাষীর উৎপন্ন শস্যের নির্দ্ধারিত একাংশ পল্লীসঙ্ঘের প্রাপ্য। অন্যান্য ভদ্রাভদ্র গৃহস্থ পরিবারেরও সর্ব্বপ্রকার আয়ের একাংশ সঙ্ঘের তহবিলে জমা দিতে হয়। এই তহবিল হইতে পল্লীবাসীর রাজস্ব, চৌকীদারী ট্যাক্স, ঔষধালয়, বিদ্যালয়, প্রভৃতির খরচ, রাস্তা নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, পতিত জমির চাষ আবাদ, খাল, ডোবা, নালা, প্রভৃতির পঙ্কোদ্ধার, এপ্রকার যাবতীয় কার্য্য করা হয়।

এক বৎসর না যাইতে সঙ্ঘের হাতে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হইল। নিত্য আবশ্যকীয় খরচ বাদে উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা ইতিমধ্যেই একটি ছোটখাট ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। এই ভাণ্ডার হইতে সমস্ত পরগণার প্রত্যেক পরিবারের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়, এবং সঙ্ঘের সমস্ত সদস্যের যাবতীয় দেনা এখান হইতে নামমাত্র সুদে পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

জগদিন্দুর আশা বৃহৎ। তথাপি সকলের একাগ্র চেষ্টায়

ইতিমধ্যেই তাহার বৃহৎ আশার সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সকল গ্রামের প্রধান প্রধান অধিবাসীগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই পল্লীর শ্রীবৃদ্ধিমানসে এই মহাসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছে; বিশেষতঃ, সকলগুলি গ্রামই কৃষকবহুল। তাহারা নিরক্ষর, কিন্তু শান্তিপ্রিয়। কাজেই সঙ্ঘগঠন কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজেই এখানে অগ্রসর হইতেছে।

প্রথম প্রথম দুই চারিজন দুষ্ট লোক এই মহানুষ্ঠানের কার্য্যে জগদিন্দুকে যথেষ্ট বেগ দিতেছিল। নিজের নিঃস্বার্থ কর্ম্মকুশলতা এবং সামাজিক শাসনের সাহায্যে সেই সকল দুষ্ট লোকের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিতে জগদিন্দুর বেশী দিন লাগে নাই। আজকাল আর সঙ্ঘের হিতকর কার্য্য প্রণালীর প্রতিপক্ষ কেহই নাই।

প্রজাগণ বুঝিয়াছে যে, আয়ের একাংশের বিনিময়ে তাহারা যাহা পাইতেছে, তাহা ব্যক্তিগত হিসাবে কেহই আশা করিতে পারে না। সঙ্ঘবদ্ধ, মিলিত হিসাবে প্রত্যেক গৃহস্থের সাধারণ সকল দায়িত্বই পরস্পর সমানভাবে পূরণ করা হইতেছে। কার্য্যতঃ সংহতিশক্তির অপরিসীম উপকারিতা এবং লাভালাভের সমতা—উপলব্ধি করিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তে সঙ্ঘের উন্নতির জন্য কার্য্য করিতেছে।

জমিদার মহাজনের ব্যক্তিগত হিসাবে কাহারও উপর উৎপীড়ন নাই। পুলিশ চৌকীদারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক মাত্র নাই। পরস্পর ঝগড়া বিবাদ প্রায় নাই বলিলেও হয়; যাহা আছে, তাঁহার মীমাংসার জন্য 'আদালতঘর' করিতে হয় না। গ্রামের সকল অবস্থা যাঁহারা

সুপরিজ্ঞাত, সেই সকল নেতৃস্থানীয় সালিশের দ্বারা সকল বিষয়ের সুবিচার হইয়া থাকে !

কাহারও বেকার বসিয়া থাকিতে হয় না—সঙ্ঘের কার্য্যে, উপযুক্ত পারিশ্রমিকে সকলেই খাটিয়া খাইতে পায়। অনাহারে আর কেহ মরিয়া যায় না—সঙ্ঘের দাতব্যভাণ্ডার হইতে সকলেই দুবেলা দুমুঠা খাইতে পারে। রোগীর চিকিৎসা ও সেবা, স্বাস্থ্যোন্নতির যাবতীয় কার্য্য, বাধ্যতামূলক শিক্ষালাভ, সর্ব্ববিষয়েই মিশ্রাদগঞ্জ পরগণা এক মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়াছে।

এই ভাবে দুই চারি বৎসর পরে সেই প্রদেশে সঙ্ঘের অর্থে—পাট, ধান, কাপড় এবং তৈলের কল স্থাপন করা হইবে, এবং অন্যান্য শিল্প বাণিজ্য ঘটিত উৎকর্ষ সাধন করাও সঙ্ঘের অন্যতম উদ্দেশ্য।

জগদিন্দুর ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ভদ্রাভদ্র বিচার নাই। যেখানে যে সময় তাহার প্রয়োজন হয়, সদা হাস্যমুখে তিনি ভেদ-বিচার না করিয়াই সেই সকল স্থানে উপস্থিত থাকেন। কোনও অভিমান বা মর্য্যাদাবিচার নাই—তাহার কাছে সকলেই সমান, সকলেই তাঁহার ভ্রাতৃস্থানীয়।

এইরূপে তিনি পরগণাস্থিত সর্ব্বজনের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও স্নেহের কেন্দ্রীভূত দেবাসনে স্থাপিত হইয়াছেন। সকল বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার বশীভূত।

কেবল একটি বিষয়ে প্রজাবর্গ তাঁহার অবাধ্যতাচরণ করিয়াছে। তিনি ভোলানাথের প্রাপ্য খাজানা মিটাইয়া দিবার জন্য প্রথমেই—প্রজাসঙ্ঘকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রজারা তাহাতে সম্মত

হয় নাই। তিনি মহা ত্যাগশীল কর্ম্মী পুরুষ, তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দিলে প্রজাবর্গের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হইবে না বলিয়া,—রাজস্বের তহবিল সমসের খাঁর হাতে পৃথকভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

প্রজাবর্গের ইচ্ছা, জগদিন্দুর ন্যায্য অধিকার ছাড়িয়া দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তাহারা ভোলানাথের প্রাপ্য রাজস্ব মিটাইয়া দিবে নচেৎ সেই বিষয়ে তাহারা কর্ণপাতও করিবে না।

কাজেই চেষ্টা করিয়াও এই একটি বিষয়ে জগদিন্দু অকৃতকার্য্য হইয়াছেন! নচেৎ একমাত্র তাঁহারই আদেশে সঙ্ঘের অপরাপর যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, এই কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

সকলেই জানে—সর্ব্বত্যাগী, মহৎ, উদার, নির্লিপ্ত কর্ম্মী তিনি, পক্ষপাত বা স্বার্থচিন্তা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কাজেই তিনি যাহা করেন তাহাই সর্ব্বজনীন মঙ্গলকর, একথা সকলেই নিঃসন্দেহরূপে মানিয়া লইয়াছে।

অন্দরে অনুশীলারও কর্ম্মের বিরাম নাই। তাঁহার অধীনে নারীসংঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। যথানিয়ম নারী জাতির হিতকর সমস্ত কার্য্য এই সঙ্ঘ হইতেই করা হইয়া থাকে, তদ্দরুণ আবশ্যকীয় অর্থ মহাসঙ্ঘ হইতে পৃথক ভাবে প্রদত্ত হয়।

এতদ্ব্যতীত, অনুশীলাই জগদিন্দুর শক্তির মূলীভূতা। তাঁহার সেবা, যত্ন, প্রণয়-রূপ স্নিগ্ধ অমৃত-সেবনেই জগদিন্দুর কর্ম্মশক্তি প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

জটিল সমস্যা সমাধানে মন্ত্রণাদাতৃ তিনি; প্রতিকূল ঘটনার

সংঙ্ঘটনে তিনিই—জগদিন্দুর প্রাণে নূতন উদ্যম ঢালিয়া দেন; তাঁহারই নির্ম্মল প্রেমামৃতপানে নবীন কর্ম্মীর প্রাণে বিরামহীন কর্ম্মশক্তি সৃজিত হয়। বিশ্রামের সঙ্গিনী, অবসাদে উৎসাহদাতৃ—আশাভঙ্গে নবশক্তিরূপে—অনুশীলাই জগদিন্দুর মহান ব্রত-সাফল্যের নিদান।

আজি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া সামান্য জলযোগান্তে জগদিন্দু পল্লীকেন্দ্র পরিদর্শনার্থ বাহির হইয়া গিয়াছেন। ঠাকুর বাড়ীর নাটমন্দির-কেন্দ্রে বিবিধ পুষ্পাভরণে সাজিয়া শ্যামল ও দয়িতা নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেছিল; অদূরে অনুশীলা গ্রাম্য মহিলাগণের মধ্যে বসিয়া নানা প্রকার শিল্পচর্চ্চা করিতেছেন। আজি সঙ্ঘস্থাপনের ষাণ্মাসিক উৎসব। গ্রাম্য বালক বালিকাগণের বিদ্যালয় বন্ধ, তাই ঘরে ঘরে আনন্দোৎসবের হাস্য কলরব উঠিয়াছে।

সহসা মুক্তকচ্ছ, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর এক দিব্যকান্তি ব্রাহ্মণ সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সুশিক্ষার প্রভাবে, খেলা ভুলিয়া বালক বালিকা—দেবকান্তি দ্বিজবরের পদতলে নমিত হইল!

অন্তরের তাপ—দেহের বেদনা ভুলিয়া অমনি ব্রাহ্মণ স্নিগ্ধ, সুন্দর, বিনয়-বিনম্র শিশুদ্বয়কে বক্ষে তুলিয়া লইয়া সরল প্রাণে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পরে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন তিনি বালক বালিকার প্রকৃত পরিচয়-প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আচারভ্রষ্ট, ম্লেচ্ছস্বভাব—ভোলানাথ! আর এই শ্যামল তার বংশধর! দয়িতার পিতাকে তিনি ভালমতই চিনিতেন। তাই তিনি দয়িতাকে বলিলেন, "তোমার বাবাকে ডেকে আন ত মা!"

বিমর্ষমুখে বালিকা উত্তর করিল—"তুমি ঠাকুরবাড়ীতে এসে বোস, বাবা ত' বাড়ী নেই, দূরে কোথায় গেছেন। নৈলে ডেকে আনতে পারতেম।" বালিকা মনে করিল, 'ইনি এসেছেন—বাবার বাড়ী থাকাই উচিত ছিল।'

"তোমার মা বাড়ী আছেন ত? তোমার ঠাকুরমা?" বলিয়া ব্রাহ্মণ আদর করিয়া দয়িতার চিবুকস্পর্শ করিলেন।

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কুসুম-কোরক-নিভনয়নে শিশিরাশ্রু মাখাইয়া ম্লানমুখে বালিকা বলিল—"ঠাকুরমা কাশী গেছেন। মা আছেন—তিনি কি আপনার কাছে বেরুন?"

"আমার পরিচয় পেলে বেরুতে পারেন।"

"বল 'ঠাকুর মশায়' এসেছেন।" বলিয়া ব্রাহ্মণ দয়িতাকে বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিলেন। শ্যামল কৌতূহলবশে বলিল,—

"আপনি ঠাকুর মশায়? সকলেরই ঠাকুর মশায়? আমাদেরও ঠাকুর মশায় আছেন। ঠাকুরমা বলেছেন—তিনিও আসবেন, আজ কি কালের ভিতরই আসবেন। কত ফুলতুলে দিয়ে এসেছি—তিনি পূজা করেন কিনা। আপনি পূজা করেন?"

বিস্ময়-নির্ব্বাক ব্রাহ্মণ কি বলিয়া যে এই সরল, উদার বালকের সোৎসুক প্রশ্নের উত্তর দিবেন তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার মনে হইল, সত্য উত্তর দিলে বুঝি এই সংসারজ্ঞানহীন শিশুরও প্রাণটি পুড়িয়া যাইবে।

ঠাকুর মহাশয়ের আগমনসংবাদ শুনিয়া আসনহাতে—অনুশীলা সেখানে আসিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় সহাস্যমুখে আসন পরিগ্রহ করিলে

অনুশীলা গল-লগ্নীকৃতবাসে তাঁহার চরণ-বন্দনা করিয়া সুমধুর বিনয়-বাক্যে কুশল প্রশ্নাদি করিলেন।

অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ নাই বলিয়া তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। শিষ্যের 'আশ্রমে' গুরুদেব অনেকক্ষণ তাই উপযুক্ত সম্ভাষণ প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া, অনুশীলা গুরুদেবের মার্জ্জনাভিক্ষা করিল।

অচিরে গুরুদেবের জন্য সত্যভামা দেবীর শয়নঘর যথাযোগ্য-রূপে সজ্জিত হইল। শ্যামল ও দয়িতা কোমর বাঁধিয়া গুরুদেবের খুঁটিনাটি কার্য্য করিয়া দিতে লাগিল। শ্যামল নিজ হাতে ঠাকুর মহাশয়ের জন্য তামাক সাজিয়া আনিল, দুইজনে মিলিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকাণ্ড ভুঁড়িশোভিত বরবপু তৈলাক্ত করিয়া দিল। বিমল আনন্দে সকল দুঃখ ভুলিয়া ব্রাহ্মণ, স্নানাদি সমাপনান্তে পূজা আহ্নিকে মগ্ন হইলেন।

যথাকালে জগদিন্দু আসিয়া গুরুদেবের আগমনজনিত আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া গেল। ইতিমধ্যে নবগোপালের অত্যাচার-কাহিনী সমস্ত গ্রামে নানা বর্ণালঙ্কার সংযোগে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ সকলে আসিয়া ঠাকুর বাড়ী ভরিয়া ফেলিল।

শান্তিময়ী গভীর মনোদুঃখে সমস্তদিন ঠাকুরঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া—কাঁদিয়া কাটাইয়াছেন। কাজেই আর কেহ শ্যামলের খোঁজ করিল না। শ্যামল প্রায়ই ঠাকুর বাড়ীতে দয়িতার সঙ্গে আহার করিত—আজ দুইজনে পরম ভক্তিসহকারে ঠাকুর মহাশয়ের প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইল।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনার অব্যবহিত পরে, শ্যামল গল্পচ্ছলে ঠাকুরমাকে দয়িতাদের বাড়ী ঠাকুর মহাশয়ের আগমনের কথা জানাইল। শান্তিময়ী এখন জানিতে পারিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় তখনও গ্রাম ত্যাগ করিয়া যান নাই। অভুক্তা, অস্নাতা শান্তিময়ী—; মান, অভিমান, সদ্ভাব, অসদ্ভাব, সকল ভুলিয়া অমনি শ্যামলের হাত ধরিয়া একেবারে ঠাকুর বাড়ীতে আসিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন।

অধ্যাপকের ক্রোধ, বালুকার উত্তাপ তুল্য। তাঁহাদের ক্রোধ, যেমন সহজেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে, আবার তেমনি অতি শীঘ্র শীতল হইয়া যায়।

বহুপূর্ব্বেই শাস্ত্রী মহাশয় সমস্ত কথা ভুলিয়া, গ্রাম্য বিজ্ঞজন-মণ্ডলীর সহিত বহুবিধ শাস্ত্রালাপে রত হইলেন; সস্নেহে শান্তিময়ীকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, গুরুশিষ্যসম্বন্ধ ক্রোধ অভিমানের অতীত—সমুচ্চ, সূক্ষ্ম এক মহান তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মনে মুহূর্ত্তের জন্যও ভোলানাথের অমঙ্গলকামনা জাগে নাই। বিশেষতঃ মূর্খ, চাটুকার পরাশ্রিত নবগোপালকে তিনি নিতান্ত দয়ারপাত্র বলিয়াই মনে করেন!

শান্তিময়ীর বহু অনুরোধে, ইচ্ছা সত্ত্বেও—শাস্ত্রী মহাশয় ভোলানাথের গৃহে পদধূলী দিতে পারিলেন না। কারণ, পরদিন গ্রামান্তরে তাঁহাকে অপর কোনও শিষ্যগৃহে স্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে।

অনুশীলা এবং জগদিন্দুর মিলিত উপরোধে শান্তিময়ী ঠাকুর-বাড়ীতে রন্ধনাদি করিয়া গুরুদেবের প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহাদের আড়ম্বরহীন ভক্তিপূর্ণ ব্যবহারে আজি জীবনের প্রথম শান্তিময়ী পুত্র-পুত্রবধূর অকৃত্রিম সেবার পবিত্রতা উপলব্ধি করিলেন!

ভোলানাথ ও পারুল তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূ-তুল্য বটে—কিন্তু ভ্রষ্টাচারী, বিলাসমগ্ন তাহারা। এযাবৎ তাহাদের সেবা, শ্রদ্ধা বা যত্ন উপভোগ কবিবার স্বযোগ শান্তিময়ী পান নাই।

পক্ষান্তরে সেবা, যত্ন, শ্রদ্ধা, আপ্যায়ন—জগদিন্দু ও অনুশীলার স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি। শত্রু-মিত্র-ভেদ তাহরা জানে না। মাতৃস্থানীয়া শান্তিময়ীর চরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাহাদের জানা ছিল। কাজেই মাতৃজ্ঞানে তাহারা শান্তিময়ীর অভ্যর্থনা করিলেন।

এইরূপে সেইদিন হইতে শান্তিময়ী পরমতৃপ্তির সঙ্গে জগদিন্দু এবং অনুশীলার সংসর্গ উপভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং কার্য্যকুশলতা দেখিয়া তিনি সত্যই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন।

---

(৯)

শ্যাটো আর পারুলের মধ্যে মনোমালিন্যের ব্যবধান উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। প্রকৃত দাম্পত্য-প্রণয় যে কি বস্তু তাহা তাহারা কখনও উপলব্ধি করে নাই। সম্ভোগলিপ্সা এবং উদ্দাম যৌবন-চাঞ্চল্যের উপরই—তাহাদের বাহ্যিক সম্প্রীতির সম্বন্ধ সংস্থাপিত ছিল।

কালস্রোতে যৌবনের নদীতে ভাঁটা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই দম্পতির কল্পিত প্রণয়-জল-তরঙ্গ অতীতের সহিত মিলাইয়া গেল। আন্তরিক ভালবসার অভাব দিনের দিন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

তদুপরি শান্তিময়ীর প্রতি পারুলের নির্ভাজ—তাচ্ছিল্যের ব্যবহার, নিঃস্বপ্রায় শ্যাটো বরদাস্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। শান্তিময়ীর সঞ্চিত অর্থ এবং নির্দ্দায় বিষয়াংশই শ্যাটোর ভবিষ্যতের অবলম্বন।

মনে যাহাই থাকুক না কেন, এই অবস্থায় সামান্য বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই শান্তিময়ীর একান্ত বশীভূত হইয়া চলা কর্ত্তব্য, শ্যাটোর এই কথা বুঝিবার মত বুদ্ধি ছিল।

কিন্তু নিজ খেয়ালের চরিতার্থতা সাধন এবং উদ্দাম আরামের অনুসরণ—ইহাই পারুল জীবনের চরম লক্ষ্য করিয়া লইয়াছে। কাজেই শ্যাটো বা শান্তিময়ী কাহারও মনস্তুষ্টিসাধন করাও যে

তাহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, সেই কথা সে মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবে না।

এইভাবে আরও কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে নিত্য কলহ লাগিয়াই ছিল, ক্রমে সেই কলহ প্রবলতর হইয়া পূর্ণ বিচ্ছেদে পরিণত হইয়াছে। আজ এক মাসের অধিক কাল শ্যাটো, পারুলের মুখ-দর্শন করে নাই।

শ্যাটোর অনাদর উপেক্ষায় গর্ব্বিতা পারুল অত্যন্ত ম্রিয়মান ভাবে দিন অতিবাহিত করিতেছে। নির্জ্জনে একাকী বসিয়া সে নিত্য অতীত জীবনের সকল কথা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ভাবিয়াছে এবং অন্তরের মধ্যে অনুতাপের তুষানলের দাহিকাশক্তি অনুভব করিয়াছে। কিন্তু অজানা, অহেতুক অভিমানে সে শ্যাটো বা শান্তিময়ীর কাছে মাথা নত করিবার সৎসাহস সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

সামান্য একজন পরিচারিকা ব্যতীত পারুলের পরিচর্য্যার নিমিত্ত আর দ্বিতীয় প্রাণী কেহই নাই। কুলবধূর নিত্যাবশ্যকীয় আহার্য্য এবং পরিচ্ছদ ব্যতীত তাহার সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যখরচ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবম্প্রকার নির্য্যাতন এবং স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদ-জনিত মনস্তাপে পারুলের উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে নম্রতার ভাব ধারণ করিতেছে।

আবছায়ার মত পারুলের মনে হইল, 'বুঝি অবাধ স্বাধীনতা অপেক্ষা পাত্রভেদে অধীনতার মধ্যে উপভোগ্য কিছু আছে; বুঝি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবনের আরাম—বিভ্রান্তির নামান্তর মাত্র।

সমাজ ও সংসারের চিরন্তন বাধ্যতামূলক নিয়মিত নির্ভরশীলতার মধ্যেই বুঝি সত্য সুখের নিদান নিহিত আছে।' কিন্তু বস্তু এবং পাত্র বিশেষের মত পারুল ভাঙ্গিতে পারে—মচ্‌কাইতে চাহে না।

পক্ষান্তরে আশৈশব চরিত্রহীন, হেয় স্বার্থপর, কুটিল শ্যাটো জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত নিঃশেষিতপ্রায় রূপ-যৌবনা, সম্ভোগ-সঙ্গিনীরূপা গৃহিনীর কথা ভুলিয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনের অবশিষ্ট সুখের দিনগুলি পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়া লইবার নেশায় ভরপুর শ্যাটো, তাই নূতন আরাম উপাদানের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া কোনও প্রকারে দিন কর্ত্তন করিতেছে।

স্নেহান্ধতা বশতঃ বুদ্ধিমতী শান্তিময়ী শ্যাটোর চরিত্রের প্রকৃত-স্বরূপ—আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কিন্তু নারীর দুঃখ নারীই বুঝিতে পারে! শান্তিময়ী শ্যাটোকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, সেই স্নেহের মধ্যে স্বার্থচিন্তার ভাঁজ ছিল না।

পুত্রাধিক ভোলানাথের ধর্ম্মপত্নি পারুল তাই শান্তিময়ীর একান্ত স্নেহের পাত্রী। তাহার শত দোষ তিনি বয়ঃসুলভ চপলতা বলিয়াই উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

আত্মনির্ভরশীলা শান্তিময়ী কখনও বধূর সেবার প্রত্যাশা করেন নাই, তাই সেই অভাবও তিনি অনুভব করিতে পারেন নাই। তিনি চাহেন, বধূর সঙ্গে শ্যাটো পবিত্র দাম্পত্যপ্রণয়সুখে সংসারধর্ম্ম পালন করুক; তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনের চতুর্থ পর্য্যায়ের দিনগুলি কোনও প্রকারে কাটিয়া যাইবে।

কর্ত্তা মাধবগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় মৃত্যুকালে নিগূঢ় স্বত্বে, সমস্ত

বিষয় সম্পত্তি শান্তিময়ীকে উইল করিয়া দিয়া যান। মাতামহের জীবদ্দশায় ভোলানাথের মাতৃ বিয়োগ ঘটে, কাজেই আইনত কর্ত্তার বিষয়ে ভোলানাথের কোনও দাবীই নাই।

আইন অনুসারে কর্ত্তার ষোলআনা সম্পত্তি জীবনস্বত্বে শান্তিময়ী দেবীরই প্রাপ্য। সেই স্বত্ব প্রবলতর করিয়া কর্ত্তা দান বিক্রয়ের সম্পূর্ণ অধিকার শান্তিময়ীকে দিয়া গিয়াছেন।

কর্ত্তার মৃত্যুর পরে শান্তিময়ী যথারীতি সেই উইলের প্রবেট গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অচিরে এক উচ্চতর ভাবের প্রেরণায় তিনি সেই কথা গোপন রাখিয়া, ভোলানাথকেই বিষয়ের অর্দ্ধাংশের ন্যায্যাধিকারী বলিয়া প্রচার করেন।

ভোলানাথ শান্তিময়ীর পরম স্নেহেরপাত্র। পুত্র নির্ব্বিশেষে শান্তিময়ী আশৈশব ভোলানাথকে প্রতিপালন করিয়াছেন। অবশেষ শান্তিময়ী তাঁহার সমস্ত বিষয়ই ভোলানাথকে দিয়া যাইবেন, এই সঙ্কল্পও তিনি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন।

তাঁহার দান অপেক্ষা কর্ত্তার উত্তর-অধিকার-সূত্রে বিষয়প্রাপ্তি, ভোলানাথের অধিকতর গৌরব ও শ্লাঘার বিষয়। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তিণী হইয়া স্নেহশীলা শান্তিময়ী, ভোলানাথকে কর্ত্তার উত্তরাধিকারী-রূপে স্থাপিত করিয়াছেন।

কার্ত্তার উইলের বিষয় শাস্ত্রী মহাশয় এবং অপর একজন বিদেশী বন্ধু ব্যতীত আর কেহই অবগত ছিলেন না। প্রবেটগ্রহণ ব্যাপারটাও শান্তিময়ী কৌশলে গোপন রাখিয়াছিলেন।

শান্তিময়ীর সৌভাগ্যক্রমে জগদিন্দুও এত বড় ব্যাপারটার সুযোগ

গ্রহণ করেন নাই। আইনজ্ঞ উকীলগণের মিলিত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, জগদিন্দু ভোলানাথের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইনের আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। তাঁহার সূক্ষ্ম সদসৎ বিচারবুদ্ধি ও আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞান অন্য কোনও যুক্তি তর্কের বাধা মানে নাই।

"মাধব গোবিন্দ বাবুর দৌহিত্র সে—তাঁহার বিষয়ে ভোলানাথের সম্পূর্ণ নৈতিক অধিকার আছে। সেই অধিকার অস্বীকার করিয়া ক্ষুদ্র অন্তঃকরণের পরিচয় দিব না।"

এই বলিয়া জগদিন্দু এত বড় একটা মাহাস্ত্র হাতছাড়া করিয়া দিয়াছেন।

"যাহা সত্য তাহা চিরদিনই সত্য।" এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জগদিন্দু ভোলানাথের মোকদ্দমার মূল বিষয়ীভূত জাল দলিল গুলির কৃত্রিমতা সপ্রমাণ করিবার জন্যই এতগুলি মোকদ্দমা করিয়া ফলে দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়াছেন।

সত্য মোকদ্দমায় পরাজয়ের পর জগদিন্দু বুঝিয়াছেন আদালতে সুবিচার পাওয়া যায় না। তাই একটা প্রবল বিতৃষ্ণার বন্যা আসিয়া তাঁহার বিষয়বৈরাগ্য জন্মাইয়া দিয়াছে।

পক্ষান্তরে পল্লির সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া শ্যাটো একাকী সকল বৈষয়িক দুশ্চিন্তার ভার বহন করিতেছে।

শান্তিময়ী শ্যাটোর অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া বড়ই দুর্ভাবনায় পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রতিবিধানের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ক্রমে চৈত্র মাস আসিয়া পড়িল। সদর খাজানার কিস্তির

তারিখ ও ঘনাইয়া আসিয়াছে ষ্টাটের তহবিলে সামান্য কয়টি টাকাও আর অবশিষ্ট নাই। সেই দিনকার ঘটনার পর এই অবস্থায় মাসীমার সাহায্য চাহিবার সাহসও ভোলানাথের নাই।

নবগোপাল ভগিনীর আশ্রয়ে তখনও ভোলানাথের গৃহেই বাস করিতেছিল। তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া মাসীমার অসন্তুষ্ট বিধানের কল্পনাও তাই সফল হয় নাই।

ভাবনাকাতর ভোলানাথ অন্দরের বাগানে এক লতাকুঞ্জবিচ্ছায়ে বসিয়া মদ্যপান করিতে করিতে ভাবিতেছিল, "বাস্ ডুবেছি—না ডুবতে আছি!"

মামলা মোকদ্দমা আর বড়মানুষীর কুহক গর্ভে মাতামহ-সঞ্চিত তিন চার লক্ষ টাকা কয়েক বৎসরের মধ্যে নিঃশেষে খরচ করিয়া, আজি ভোলানাথ লক্ষাধিক টাকার দেনদার হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক বৎসরের জন্য আরব্য ঔপন্যাসিক গোছের একটা সংক্ষিপ্ত নবাবী করিয়া, আজি ভোলানাথের জীবনমধ্যাহ্নেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে; ভোলানাথ তাই ভাবিতেছে,—

"বাস্ এক রাত্তিরের নবাবী—ভোর না হ'তেই শেষ হ'য়ে গেল! ভোরের বেলায় চক্ষু মেলে দেখছি, সেই ভবঘুরে কুলীনপুত্র ভোলানাথ আমি। তাসের খেলা ঘর হাওয়ায় উড়ে গেল।"

অনেকক্ষণ ভোলানাথ এই ভাবে ভাবনামগ্ন ছিল, হঠাৎ—

কে বলেরে শ্যামা আমার—
শিব দলিছে চরণতলে!
অশিবনাশী, একা বামা—
প্রবল নাশে প্রলয় জলে!!

গাহিতে গাহিতে ভজহরি আসিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিয়া দিল।

সুকণ্ঠ ভজহরি দিব্য ভাবাবেশে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার উন্মাদনাময় সঙ্গীতের সুধাতরঙ্গে শ্যাটোকে ডুবাইয়া রাখিল। সঙ্গীত শেষ হইল। কিন্তু সেই সুরলহরী বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া উন্মাদনময় একটা সুমধুর উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া দুইজনে সেই সুদূরবিস্তৃত ভাবলহরীতে নিমজ্জমান হইয়া রহিল।

অবশেষে দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে সস্নেহে ভজহরির হাত দু'খানা নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া শ্যাটো বলিল,—

"ভজহরি সত্যই কি তুমি পাগল?"

ভাবহীন উদাসদৃষ্টি—অদূরে দেবদারু-তরু-শিখর-সমাসীন, চুম্বন-চুম্বক-সম্বদ্ধ যুগ্ম বিহঙ্গের দিকে নিবদ্ধ করিয়া ভজহরি বলিল—"পাগল নয় কে বাপু?"

শ্যাটো বুঝিল না যে এই উক্তি সত্যই পাগলের, না সত্যানুসন্ধিৎসু দার্শনিকের। অন্য মনস্কে সে আবার প্রশ্ন করিল,—

"সবাই যেমন পাগল—তুমিও কি তেমনই পাগল ভজু?"

"তা জানি না বাবা!" বলিতে বলিতে ভজহরি সুদূর প্রান্তর-প্রান্তে রক্তিম গগনের পটে বিশ্ব-শিল্পীর অপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্য মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিল।

শ্যাটো তখনও স্বীয় ভাবনায় বিভোর। দৃঢ়কণ্ঠে সে প্রচার করিল—"না ভজু তুমি পাগল নও।"

রাগতস্বরে ভজহরি—"ইস্! বেটা যেন ডাক্তার সিমসনের ইষ্টিগুরু এসেছেন। সবাই বলে পাগল, তবু পাগল নই!" বলিতে

বলিতে এক অজানা সঙ্গীতের সুর—গুন্ গুন্ তানে আওড়াইয়া গাত্রোত্থান করিল।

খ্যাটো—ব্যগ্র, আনত-দৃষ্টিতে ভজহরির পানে চাহিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল,—"যেওনা ভজু! দাঁড়াও। সত্যি ভাই সংসারে সবাই পাগল—আমিও একটা মস্ত পাগল।"

"বেশ হাত ধরাধরি কোরে গারদে যাই চল।" বলিতে বলিতে ভজহরি এক বিরাট হাসির তরঙ্গ আকাশে ঢালিয়া দিল।

খ্যাটো উদাস দৃষ্টিতে দূরে—কাল মেঘখণ্ড সমষ্টির তলে অস্তাচল-গামী দিবাকর-বিকীর্ণ লোহিত আস্তরণের শোভা দেখিতে দেখিতে বলিল—"তা কি হবে ভজু—এই মহা গারদ ছেড়ে, ভাবের গারদে কি যেতে পারব ভজু?"

"দ্যাখ, ভেবে দ্যাখ—আমার অনেক কাজ। পাগলা ছেলেরা গাঁ খানা ঝেড়ে ঝুড়ে তক্ তকে করে তুলেছে—দেখবো না? তাদের গান গেয়ে শোনাব না?" বলিতে বলিতে ভজহরি দ্রুত প্রস্থান করিল।

মেঘমন্দ্রের গভীর নির্ঘোষ-ঝঙ্কারে ভজহরির ভক্তি উৎস—

হৃদে আয় মা সর্ব্বনাশী
প্রলয়বিষাণ উঠল বেজে—

তড়িতের শিহরণ সহ খ্যাটোর হৃদয়তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া দূরাকাশে লীন হইল।

খ্যাটো ভাবিল—"ভজা পাগল, আমি পাগল—জগদাও পাগল। ভজা পাগল ভাবে—জগদা পাগল প্রাণের আকর্ষণে—আমি পাগল স্বার্থের নেশায়! সমুদ্রপ্রমান প্রভেদ।"

শ্যাটো বিরাট ভাবনাবর্ত্তে পড়িয়া গভীর মনোবেদনায় দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল। এমন সময় শান্তিময়ী সেইখানে আসিয়া ডাকিলেন,—

"ভুলো!"

"মাসীমা!" বলিয়া শ্যাটো ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিল।

"সদরে কিস্তির টাকা পাঠিয়েছিস?" স্নেহার্দ্র কিন্তু দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করিয়া, শান্তিময়ী শ্যাটোর প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

একটু লজ্জিতভাবে ইতস্ততঃ করিয়া শ্যাটো, ভগ্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে বলিল,—

"কোত্থেকে পাঠাব মাসীমা? প্রজার বিদ্রোহ সমান ভাবে চলছে, পাইক গোমস্তা অধিকাংশই চাকুরী ছেড়ে চলে গেছে। ক্যাশে বুঝি আজ আর একশ'টি টাকাও অবশিষ্ট নাই! এত টাকা কোথায় পাব মাসীমা?"

সুমধুর অভিমান-ব্যঞ্জক তিরস্কারের স্বরে শান্তিময়ী বলিলেন,—
"জমিদারী লাটে উঠেছে, আর তুই বাগানে বসে এখনো ঐ ছাইপিণ্ডি গিলছিস্? লজ্জা করে না ভুলো?"

অতি সত্য কথাই শান্তিময়ীর কণ্ঠে বাজিয়া উঠিয়াছে। শ্যাটো আজি অনেকদিন পরে স্বীয় অবস্থাবিপর্য্যয়ে লজ্জিত হইয়াই, সে লজ্জা ঢাকিতে আকণ্ঠ বিষ পান করিতেছিল।

মদ্যপের প্রকৃতির বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে, অচিরে মদ্যপানের বিষময় ফল বুঝিতে পারিয়াও, অধিকাংশ মদ্যপ—স্বীয় জঘন্য লোক লজ্জা ঢাকিয়া রাখিতে আবার সেই বিষ পান করিয়া অজ্ঞান হয়।

জীবনসংগ্রাম-নিষ্পেষিত কর্ম্মী যেমন—পীড়ন-পিষ্ট চিত্তের দৌর্ব্বল্য-বশে, অলস নিদ্রায় জড়তা আশ্রয় করে।

খ্যাটোকে নীরব দেখিয়া শান্তিময়ী আবার বলিলেন,—"ভুলো, আমি তোর কে?"

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে এবার খ্যাটো বলিল,—"তুমি? তুমি আমার মা। আমি অতিবড় পাষণ্ড; তবু আমারই জন্য যে কত বড় একটা স্নেহের ভাণ্ডার নিঃশেষে অপব্যয় কচ্ছ—তা আমি বুঝতে পারি মাসী মা।"

"তাই যদি হয়, কেন আমার কাছে টাকা চাসনি?" বলিতে বলিতে অভিমানিনীর দুটি চক্ষু বহিয়া দর দর অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল।

যতদিন সেই সাহস ছিল, খ্যাটো মাসীমাতার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে লজ্জানুভব করে নাই। কিন্তু কার্য্য-করণে—স্বেচ্ছায়, স্বকর্ম্ম-দোষে এবং অনিচ্ছায় পরকর্ম্মফলে, খ্যাটো সেই সাহস হারাইয়া বসিয়াছে। তাই ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে অবনত মস্তকে বলিল,—"সেই মুখ আর যে আমার নেই মাসীমা!"

বুদ্ধিমতী শান্তিময়ী বুঝিলেন বধূর ব্যবহারের জন্য লজ্জায় খ্যাটো তাঁহারও কাছ হইতে দূরে সরিয়া বসিয়াছে। মাতৃত্বের পূর্ণ গর্ব্বভরে তাই তিনি—খ্যাটোর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—

"বৌকে আমি মাপ করেছি ভুলো, তুইও তাকে মাপ কর। বৌ ছেলে মানুষ; বয়স হ'লে অমন থাকবে না।" প্রবল চেষ্টায় আত্মসংযতা হইয়া তিনি আবেগভরে আবার বলিতে লাগিলেন,—

"চল ভুলো! [illegible] আমার বাপের জমিদারী লাটে বিকিয়ে

যাবে, আমি কি তা দাঁড়িয়ে দেখতে পারি? আমার কি একটা ছেলে, একটা মেয়ে বা আর কেউ আছে রে—যে তোদের উপর রাগ করব আমি? চল সদরে লোক পাঠাবি চল।"

দুই বিন্দু অশ্রু মোচন করিয়া স্নেহময়ী ধীরে অন্দর অভিমুখে চলিয়া গেলেন। অন্ধ-স্নেহ, পদপ্রতিষ্ঠার মায়ামরীচিকা, পিতৃ-কুলের গরীমা মণ্ডিত যশোলিপ্সায়—সত্যই শান্তিময়ী জীবনময় এই ভ্রান্তির পথেই চালিতা হইয়াছেন।

শ্যাটোও জানিত তাহার স্নেহের উপরোধে শান্তিময়ী নিজের বিবেকের আদেশ পর্য্যন্ত অবহেলা করিয়াছেন।

মায়ের অধিক স্নেহ ভালবাসা দিয়া আজন্ম তিনি তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। প্রতিদানে শ্যাটো স্বেচ্ছাচারিতা-বশে, তাঁহাকে কত মনোদুঃখ দিয়াছে। শ্যাটোর প্রাণে অনুশোচনার ফিন্‌কি জ্বলিয়া উঠিল! অমনি ভ্রান্ত যুবক সেই আগুন নির্ব্বানাশে তরল মদিরাপ্রবাহ দগ্ধোদরে ঢালিতে লাগিল।

আস্তে নীরবে পিছন হইতে আসিয়া দয়িতা শ্যাটোর হাতখানা আপন কুসুম করপুটে চাপিয়া ধরিয়া সুমধুর বাঁশরীর সুরে বলিল,—"ছি! জ্যাঠামশায়—আবার এগুলি খাচ্ছ? ঢেলে ফেল—সেই যে সেদিন বলেছিলে আর খাবে না?"

শ্যাটোর দ্রবীভূত প্রাণে বালিকার তীক্ষ্ণ তিরস্কার-শর প্রবেশ করিল। অধর প্রান্ত হইতে সুরাপাত্র নামাইয়া সে বলিল,—

"কুকুরে যে অভক্ষ্য খেতেই ভালবাসে মা! বারণ করলে কি সে শোনে?"

বিস্ময়-বিহ্বল বালিকা স্থির গম্ভীর ভাবে বলিল,—"বেশ বল্লে! কুকুরে যা খায়, তা' বুঝি মানুষে খাবে—না?"

গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসে বুকের পাঁজর কাঁপাইয়া দিয়া খ্যাটো বলিল,—

"যারা মানুষ, তারা কি এ খায়? তবে হাত, পা, মুখ, চোখ থাকলেই ত মানুষ হয় না মা!" বলিয়া খ্যাটো বিরাট দুঃখে অধোবদন হইল। অন্যমনস্কে বলিল "তোর বাবা কি এ খায়? খায়না—একটা সত্যিকারের মানুষ কি না—তাই খায় না।"

এতক্ষণ শ্যামল ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়াছিল। খ্যাটোর কথায় সাহস পাইয়া কাছে আসিয়া সে বলিল,—

"তুমিও কেন কাকা বাবুর মত মানুষ হওনা? তিনি কি কচ্ছেন জান? রাজ্যের মানুষ নিয়ে কাস্তে, কোদালী নিয়ে লেগে গেছেন। সকলে কত টাকা তাঁর হাতে দিয়ে যাচ্ছে; কত দুঃখীকাঙ্গালী পেটভরে খেয়ে কোমর বেঁধে ক্ষেত কুপিয়ে তুলোর গাছ বুনছে; লেখাপড়া কচ্ছেন—এর ওর তার ঝগড়া মিটিয়ে দিচ্ছেন—ঠাকুর বাড়ী নিত্য কত লোক আসে জান?"

সকলই খ্যাটো শুনিয়াছিল। মনে মনে খ্যাটো জগদিন্দুর উদ্দেশে সহস্র প্রণিপাত করিয়াছে; কিন্তু সংস্কারবশে কার্য্যতঃ সে দম্ভ, অভিমান, কুটিলতার হাত এড়াইতে পারে নাই। তাই সে ভাবিল—

"মানুষ হব? এবারে নয়—আর জন্মে এই পশুত্বের কাঠামখানা পাল্টে এলে যদি মানুষ হতে পারি।"

শ্যাটো অনেকক্ষণ ধরিয়া ম্রিয়মানভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। মৌনার বেদনা স্বতঃই শিশুর প্রাণ গলাইয়া দেয়। তাই তাঁহাকে একটু প্রফুল্ল করিবার চেষ্টায় দয়িতা বলিল,—

"কাল বাবা একখানা গান বেঁধে দিয়েছেন—ভজুদা'মশায় কেমন নেচে নেচে সেই গান গেয়ে হাজার লোককে মাতিয়ে তুলছিল। শোনবে জ্যাঠামশায় ?"

শ্যাটো নীরব রহিল। সাহস পাইয়া তাই শ্যামল ও দয়িতা বসন্ত-কোকিল-দম্পতির সমস্ত মাধুরীমা কণ্ঠে ঢালিয়া, নাচিতে নাচিতে গাহিতে লাগিল—

আশিন মাসে দেশটা জুড়ে
বাজে কেন ঢাক ?
সেফালী ক্যান্ গন্ধ ছড়ায়
পদ্মে শিশির রাগ ?
রাঙ্গা কাপড় পরে—পাড়া উজল করে
বালির বুকে, কিবা সুখে—ফুটায় ফুলের ঝাক্ ।
কেঙ্গলা মায়ের কেঙ্গলা ছেলে—
তার কেন এই জাঁক !
ঝুটা গয়না রাঙ্গতা দিয়ে মাটির পুতুল গড়ি'—
বলি দেয় ক্যান ছাগল, ভেড়া, মহিষ সারি সারি।
বিরাট মাটির মা রয়েছে—শোনেনা তার ডাক !
আপন জীবন বলি দিয়ে বাজায়না ক্যান শাঁক—
বিশ্বের চোখে লাগিয়ে বিষম তাক্ !

বসন্ত সন্ধ্যায় আকাশের ঈশান কোণে তখন ঘোর কৃষ্ণমেঘ-

স্তবকের অঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া কালবৈশাখীর বিদ্যুচ্চকের সঙ্গে প্রলয় ভৈরব বজ্রপাতের বিপর্য্যয় বাদ্য বাজিয়া উঠিল। শিশুদ্বয় গাহিতে গাহিতে অদৃশ্য হইল, কিন্তু শ্যাটোর অন্ধকার অন্তরে কালবৈশাখীর সেই প্রলয় গর্জ্জন পশিল কিনা বোঝা গেল না।

---

(১০)

বৎসর ঘুরিয়া আসিল। মিয়াদগঞ্জের ছত্রহীন ভূপতি জগজিন্দুর অক্লান্ত চেষ্টা এবং পরিশ্রমের ফলে আজি পল্লীলক্ষ্মী এক অপূর্ব্ব দিব্যরূপে গৃহস্থের কুটীর দুয়ার উদ্ভাসিত করিয়া দাঁড়াইয়াছেন; ধানের ক্ষেতে, বন-নিকুঞ্জে, জলে, ফুলে, পল্লীপথে, পুকুর ধারে, সর্ব্বত্র এক ভুবনজোড়া জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সংক্ষেপ এক বৎসরের সাধনায় পল্লীনিবাসী প্রতি গৃহস্থের মুখে আবার অতীতের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভ্রাতৃবিরোধ তিরোহিত-প্রায় মহাজনের অত্যাচার নাই, জমিদারের শাসনদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

এই রূপে পল্লীলক্ষ্মীর সুমহান যজ্ঞের সমস্ত উপচার সংগ্রহ করিয়া এক বিরাট আনন্দে জগদিন্দু তাঁহার কল্পিত পল্লীস্বর্গ-সৃষ্টির অদূর সাফল্যের প্রতীক্ষায়, দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম্মস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে।

পল্লীভাণ্ডারে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত আছে; বিভিন্ন তহবিলে বিভিন্ন হিসাবের এবং অনুষ্ঠানের ধনভাণ্ডার যথারীতি রক্ষিত হইতেছে। বার মাসের বিবিধ শস্যে পল্লীগোলা পূর্ণ রহিয়াছে—অসম্ভব কল্পনা আজি, জীবন্ত সত্যে পরিণত হইয়া বিস্তৃত পল্লীকেন্দ্র মহানন্দের পূত কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তথাপি অনুশীলার প্রাণে নিয়ত একটা অতি বড় দুঃখের ধারা প্রবাহিত রহিয়াছে।

সত্যভামা দেবী গভীর মনোবেদনায় তাঁহার শৈশব-স্বর্গ পল্লীনিবাস ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। শত কাকুতি মিনতি, প্রার্থনাপূর্ণ পত্র লিখিয়াও অনুশীলা তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই। সত্যভামা জানেন না যে, তাঁহার 'অপদার্থ' পুত্র আজি তাহার জন্ম-ভূমিকে সত্যই স্বর্গরূপে গড়িয়া তুলিতেছে।

বর্ষার সিক্ত রজনী প্রভাতে কালমেঘের বুক ভেদ করিয়া সূর্য্যদেব উঁকি মারিতেছেন। দূরে ফুলবনের আর্দ্র পত্রপুষ্প-স্খলিত ঝরণার জলে স্নান করিয়া জীবন্ত কুসুম শ্যামল ও দয়িতা—সুমধুর কলোচ্ছ্বাসের সহিত পুষ্পচয়ন করিতেছে।

অন্দরের বারান্দায় বসিয়া জগদিন্দু ও অনুশীলা, শিশুদ্বয়ের কৌতুক আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে নানা প্রসঙ্গের আলাপে মগ্ন ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে অনুশীলা মাতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"এত আনন্দেও বড় দুঃখ যে মা এলেন না—তিনি এখনো এসে দেখলেন না, যে আমাদের উন্মত্ততার ভিতরও কেমন একটা সৌন্দর্য্য আজ মূর্ত্তি লয়ে ফুটে উঠেছে—তাঁহারই পল্লীতীর্থে!"

সমান বেদনা সবলে গোপন করিয়া জগদিন্দু বলিলেন, "মা নিত্যই বলতেন 'দেশে যারা উঠতে বসতে সেলাম ক'রত, তাদের চক্ষের উপর হীন হ'য়ে থাকতে পারি না।' মা কিন্তু জানতেন না, যে সেই সেলাম—উৎপীড়িত, রুগ্ন, শীর্ণ, বুভুক্ষু প্রজাপুঞ্জের বুকের পাঁজর ভেঙ্গে বেরুত—একটা প্রকাণ্ড আর্ত্তনাদের মত, উপহাসের মত। আর আজি কেহ আমাদের মিথ্যা কৃত্রিম সম্মানের সেলাম দেয় না বটে, কিন্তু যা দেয়—তা বেরোয়ও তাদের অন্তর থেকে। ভালবাসা তার নাম—সরলতা তার প্রকৃতি!"

'উঠিতে বসিতে সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে পরের অধীন যাহারা, বিষয় সত্যই সেই জাতির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড উপহাস! প্রকৃতির দান—জলে বাতাসেও যেই অভিসপ্ত প্রজাপুঞ্জের অবাধ ভোগাধিকার নাই; অসীম, অনন্ত, সদামুক্ত লবণ-বারিধির লবণ আহরণেও যেই অসহায় জাতি' প্রবলের আগ্নেয়াস্ত্র মুখে—পশু পক্ষীর অধম হীন অসহায়ভাবে প্রাণবিসর্জ্জন করে—সুখ, সমৃদ্ধি, পদপ্রতিষ্ঠা—সেই জাতির পক্ষে যে একটা কত বড় প্রহসন, তাহা বুঝিবার শক্তি তাহাদের নাই। রোগী আপন রোগের নিদান নির্ণয় করিতে পারে না!

'গৃহস্থের খেয়ালের উপর যার জীবন-মরণ নিত্য নির্ভর করে, সেই পারাবত, হংস, কুক্কুট ছাগাদিও আপাতমধুর আপ্যায়নে কল্পিত সুখে হাসির তরঙ্গে ভাসিয়া—গৃহস্থের আশে পাশে লেজুড় নাড়িয়া বিচরণ করিয়া থাকে। চাকচিক্যময় স্বর্ণখচিত মখমলের 'উর্দ্দি'-পরিহিত গোলামের জাতির মুখে তাই বুঝি হাসির তরঙ্গ বহিয়া যায়!

'এ দেশের চিন্তাধারা, শিক্ষাপ্রণালী—সকলই জীবনপাত করিয়া স্বধু পরের মুখে অমৃতগ্রাস তুলিয়া দিবার পথ সুগম করিয়া লইবার জন্য পরিচালিত। নৈলে, প্রতি বৎসর অনাহারে যেই দেশের লক্ষ দরিদ্র কৃষক অকালে মহাকালকে বরণ করিয়া লয়—সেই দধিচীর বংশধররাই আবার নিজের হাতে—নিত্য শতগোলা ধান জাহাজ ভরিয়া বিদেশে পাঠাইতে পারিত কি?

'অপরের ধন, মান, প্রাণরক্ষার্থে সাত সাগর-পারে মরিতে যায় যাহারা, তাহাদের বুকের উপর উদ্যত সঙ্গীন, বিস্ফোরকের প্রেতকীর্ত্তি অভিনয় করিতে কিন্তু, সেই উপকৃত মহাজাতির কঠোর বিবেকে একটু আঁচরও লাগে না। তবু তারাই আবার আবেদন নিবেদনের অঞ্জলি লয়ে সেই জাতির পায়ে লুটায়ে পড়ে!

'জ্বরে, বিসূচিকায় যে দেশের লক্ষ অধিবাসী নিত্য পরপারে চলিয়া যায়—একটি ফোঁটা ঔষধ কেউ মুখে তুলিয়া দেয় না; ময়ুর-পুচ্ছধারী বায়সের মত সেই দেশের রাজা, মহারাজা, ধনী, চাকুরের মিথ্যাপদ-গৌরব—কৃত্রিম হাসিস্রোত, কেবল তাদের দৈন্যই ফুটাইয়া তোলে—নগ্ন, বীভৎস জঘন্যতাই জাগাইয়া দেয়!

'যেই দেশের অন্নপূর্ণা ভূমি কোটি কাল সন্তানের অঢেল আহার্য্য জোগাইয়াও দেশদেশান্তরের শত কোটি ক্ষুধিত জীবের অন্ন সংস্থান করিয়া দিত, যেই দেশের মৃত্যু-জরা-বিজয়ী বাঙ্গালী শতেকে নব্বুই জন শতবর্ষ পরমায়ু উপভোগ করিত—সেই বাঙ্গালা আজি বর্ষায় এক ফোঁটা জলের জন্য তৃষিত দৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিয়া থাকে—জল পায় না; আর, শরতের স্নিগ্ধ রবিকরোজ্জ্বল আকাশ

ভাঙ্গিয়া—মূষল ধারে জল নামিয়া, তার মুখের অন্ন ধুইয়া মুছিয়া দিয়া যায়! প্লাবনের তোড়ে তার লক্ষ পর্ণ কুটীর ভাসাইয়া নিয়া—গাছের ডালে, পথের ধারে সারি সারি দীনতার কঙ্কাল সাজাইয়া রাখিয়া যায়!

'কেন? বিধাতার অভিসাপে। সহস্র নিরন্ন জীবের মুখের গ্রাস কাড়িয়া নিয়া যেই দেশের ধনী জমীদার অবাধে সেই অন্ন আপন মুখে তুলিয়া লয়—সেই দেশ বিধাতার অভিসপ্ত!'

ভাবিতে ভাবিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগকরিয়া আবার জগদিন্দু বলিলেন,—"তবে মা আসবেন—যেই দিন এই পল্লীর মাটিতেই আরার তীর্থের জ্যোতিঃ ফুটে উঠবে—যেইদিন লক্ষ দিব্য সুস্থ সবল পল্লীবালক পেট ভরে খেয়ে—উচ্ছিষ্ট অন্নমুষ্টি আবার শত ক্ষুধিত কুক্কুরের মুখে তুলে দিবে—সেইদিন মা আবার আস্‌বেন।"

এত বড় মহান্ ভাবের কথাটা অনুশীলা বুঝিল না। পল্লীবধূর সমস্ত সলজ্জ কাতরতা একত্র করিয়া সে বলিল,—"মাকে ফিরিয়ে আন, তাঁর পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়ে ফিরিয়ে আনি চল।"

জগদিন্দু তখন ভাব-স্বর্গের দীপ্ত স্বপ্নে বিভোর। আবেশভরে সে বলিল,—"ক্ষমা ত মার স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি—মায়ের কাছে কি আবার ক্ষমা চাইতে হয়! এই পল্লীমন্দিরে যখন মাতৃপূজার বিজয়-শঙ্খ বেজে উঠবে—ধন, বস্ত্র, রত্ন শস্যাদি ষোড়ষোপচার সাজিয়ে যখন মায়ের সন্তানগণ মাতৃপূজার শঙ্খধ্বনী করবে—মা আস্‌বেন তখন।"

এমন সময় দয়িতা ছুটিয়া আসিয়া মাতার হাত ধরিয়া বলিল,—"মা, ঘরে যাও—ওঁরা আসছেন।"

জগদিন্দু বলিলেন, "ওরা, কারারে দয়ি ?"

"সমসের দাদা, রহিম কাকা আরও অনেকে কত কি সব মাথায় ক'রে নিয়ে আসছেন। বারবাড়ীতে বসতে বললেম, তাঁরা শুনলে না—একদম বাড়ীর ভিতর চলে আসছে।"

দয়িতার কথা শেষ না হইতেই শতাধিক গ্রাম্য কৃষকে উঠান ভরিয়া গেল। প্রত্যেকের মাথায় এক একটি ঝাঁকাপূর্ণ নানা খাদ্য দ্রব্য ও বস্ত্র সম্ভার।

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সমসের বলিল, "নাও মা, আমরা সকলেই ত তোমার ছেলে—আমাদের লজ্জা কেন মা ? এই নাও, ঘরে তুলে রাখ, তোমার পূজোর জন্য এনেছি। আজ আমাদের পুনর্জন্মের সোম্বচ্ছরের দিন—মনে নেই মা ?"

জগদিন্দু এবং অনুশীলা অনেকক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এত দ্রব্যসম্ভার গ্রহণে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া জগদিন্দু কহিলেন, "এতটা কিন্তু তোমাদের বড়ই অন্যায়। ঠাকুরের যা আছে, তাতেই ত আমাদের চলে যায়,—তবু তোমরা আবার———"

জগদিন্দুর কথায় বাধা দিয়া সমসের বলিল, "ছি ছোট বাবু—ছেলের মন বোঝ না ? তোমাদের ঠাকুরপূজোয় যে ভারে ভারে মিঠাই মণ্ডা সাজিয়ে দাও—সেকি তোমার ঠাকুর কাঙ্গাল ব'লে দাও ? ছি—ছোট বাবু, গরীবের প্রাণে ব্যথা দিওনা !

"কে বলে তুমি কাঙ্গাল ব'লে দিচ্ছি ? না, না ছোটবাবু—তুমি ত' কাঙ্গাল নও। দেশের লক্ষ গরীবের শরীর, প্রাণ, মনের উপর তোমার জমিদারী—এই ঐশ্বর্য্য কয়টা রাজার আছে বলতে পার ?"

বলিতে বলিতে শ্রদ্ধাভক্তির আবেগে সত্যই বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইল। ক্ষণকাল একটা বিরাট স্তব্ধতায় সেই জনাকীর্ণ প্রাঙ্গণ আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। সমসের প্রকৃতিস্থ হইয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে আবার বলিল,—

"নাও মা নাও, আমরা সবাই কিন্তু বিকালে আসব, প্রসাদ পেয়ে যাব—আজ উচ্ছোব কর্ত্তে হয়—জান না মা?" মহানন্দে বিহ্বল সমসের, উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া লোকজনসহ বাহির হইয়া গেল।

একটা অব্যক্ত আনন্দে জগদিন্দু ও অনুশীলার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। দুই জনের গণ্ড বহিয়া যুগপৎ আনন্দাশ্রু বহিল। অনুশীলা আর্দ্র অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—

"আজি যদি মা কাছে থাকতেন, তা হ'লে বুঝতেন যে—তুচ্ছ জমিদারীর বিনিময়ে কি বিশাল রাজত্ব ক্রয় করেছি আমরা। এতগুলি সরল প্রাণের উপর যার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত, কে বলে সে কাঙ্গাল! এমন সম্মান কোন্ রাজরাণীর অদৃষ্টে ঘটেছে?"

দেখিতে দেখিতে সকল পল্লীর বিরাট জনসঙ্ঘে ঠাকুরবাড়ী ভরিয়া উঠিল। উৎসব-কলরবে চারিদিক মুখরিত হইল। জাতীয়-পতাকাধারী একদল যুবকের অগ্রে ভজহরি নাচিতে নাচিতে গাহিতে লাগিল,—

আমরা মানুষ হ'তে চাই;
বেদ-বেদান্তের বুলি গেয়ে, অলস বিলাস-কোলে শু'য়ে—
কাজ কি বেঁচে ভাই?
আমরা মানুষ হ'তে চাই।

মোদের ছিল অনেক বটে—এখন নাইক' কিছুই মোটে—
তবু জাঁক ক'রে সেই পুরাতত্ত্ব কোন্ মুখে বা গাই?
নাইক লজ্জা—মানুষ যাঁরা—মুখে দেয় যে ছাই!
আমরা মানুষ হ'তে চাই!!

---

(১১)

কোনও একটা ঝোঁক মাথায় চাপিয়া বসিলে তাহা সম্বরণ করিবার মত মানসিক বল শ্যাটোর ছিলনা। নিতান্ত খামখেয়ালি প্রকৃতি তাহার; ঘটনাবর্ত্তে সময় সময় কৃতকর্ম্মের দরুণ তাহার আত্মগ্লানি হইত বটে, কিন্তু তাহার স্থিতিকাল বড়ই অল্প।

ভাল কাজ করিবার ইচ্ছাও অনেক সময় খেয়ালের ঝোঁকে তাহার মনে উদয় হইত, কিন্তু পলকে আবার সেই শুভেচ্ছা কোথায় মিলাইয়া যাইত।

জগদিন্দুর দেশাত্মবোধ-জনিত ত্যাগের মহত্ব শ্যাটো বুঝিতে পারিত, মনে মনে সেই মহত্বের সম্মানও সে না করিত এমন নহে। তথাপি কার্য্যতঃ জগদিন্দুর কাছে মাথা নিচু করিবার ইচ্ছা, শক্তি কি সাহস তাহার ছিল না। মহত্বের সম্মান পলকে তাঁহার বিষয়বিভ্রান্তিময় কল্পনার আবর্ত্তে কোথায় তলাইয়া যাইত। অনেক সময় এক একটা পবিত্রতার মুহূর্ত্তে তাহার প্রাণে উচ্চ সংকল্পের উদয় হইয়াই আবার বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া যাইত।

শ্যাটো স্থির করিয়াছে যে, পারুলের জন্যই তাহাকে তাহার স্নেহময়ী মাসীমাতার কাছ হইতেও ক্রমশঃ দূরে সরিয়া পড়িতে হইতেছে। কাজেই পারুলের সঙ্গে তাহার সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হইবে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ত্রুটিরই সংশোধনের চেষ্টা করা সমীচীন, শ্যাটো সেই কথা বোঝে না। অসম্ভব হইলেও সেই সকল ত্রুটির মূলোৎপাটন করাটাই শ্যাটো পৌরুষের পরিচায়ক বলিয়া মনে করে।

যথোপযুক্ত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং কৌশলের সাহায্যে সে ইচ্ছা করিলে ধীরে ধীরে গৃহিণীকে উদ্দাম স্বেচ্ছাচরিতার পথ হইতে, পূত গার্হস্থ্য-সুখের পথে ফিরাইয়া আনিতে পারিত, কিন্তু সেই পথের সহিত শ্যাটো পরিচিত নহে। স্ত্রীর স্বেচ্ছাচরিতায় যখন তাহার পারিবারিক সুখের পথে বিঘ্ন জন্মিয়াছে—স্ত্রীর সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছেদই তাহার একমাত্র প্রতীকার-পন্থা বলিয়া শ্যাটো নিঃসংশয় ধরিয়া লইয়াছে।

হিন্দু কুলবধূর সহিত সম্বন্ধবিচ্ছেদ জীবনের এইপারে কোনও হিন্দুরই ঘটিয়া উঠে না, একথা বিধর্ম্মীর দুর্নীতি-অনুকরণশীল যুবক বিশ্বাস করিবে না। কাজেই দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদেও কোন পক্ষের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

দুশ্চিন্তার পীড়নে কূটচক্রী শ্যাটোর মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। বিস্মৃতির উপায় আবিষ্কার করিতে গিয়া শ্যাটো, তাহার হীন চরিত্র আরও মসিময় করিয়া তুলিয়াছে।

পক্ষান্তরে উপেক্ষিতা, স্বাধীনা রমণীর উদ্দাম চিত্তবৃত্তিও অযথা উচ্ছৃঙ্খলতার চরমে আরোহণ করিয়াছে।

বধূর প্রতি অতিশয় অন্যায় ব্যবহারে ভোলানাথের সংসারোদ্যানে যে এক ভীষণ বিষ-বৃক্ষের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা ভাবিয়া শান্তিময়ী বিরাট আশঙ্কায় দিনপাত করিতেছেন। কিন্তু কি করিলে যে এই ব্যাধির উপসম হইবে, তাহা তীক্ষ্ণবুদ্ধি শান্তিময়ীও ভাবিয়া পায়েন নাই।

আপন কক্ষে বসিয়া বেলা, দ্বিপ্রহরাতীতে পারুল আজি একটি অতীব দুঃখের গান গুন গুন করিয়া গাহিতেছিল; ক্ষণে ক্ষণে গভীর দুর্ভাবনাজনিত দীর্ঘ নিশ্বাসে তাহার বক্ষস্থল কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় কি ভাবিয়া শ্যাটো সেইখানে আসিল। তীব্র অবজ্ঞার সহিত কর্কশস্বরে সে পারুলকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"তোমার সহোদর এখনো এই বাড়ীর সংশ্রব পরিত্যাগ করতে পারেন নি কেন?"

শ্যাটোর অলঙ্কারহীন নির্জ্জলা উপেক্ষার ভাষায় অভিমানিনীর মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিল। সেও রুক্ষস্বরে প্রত্যুত্তর করিল,—

"আমার ইচ্ছায় এবং উপরোধে!"

সেই গৃহের একচ্ছত্র অধিপতি শ্যাটোর মুখের উপর এমন করিয়া সুতীব্র সত্য কথা মাথা উচু করিয়া কেহ বলিতে পারে, এমন বিশ্বাস শ্যাটোর ছিল না। তাই নিজ কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই বুঝি সে আবার বলিল,—"এই গৃহে তোমার ইচ্ছা বা উপরোধের আর কোনও মূল্য নাই—তা জান?"

"জানিনা, এবং তা যে সত্য নয় সেই কথাই প্রমাণ কর্ত্তে চাই আমি।" বলিতে বলিতে পারুল সগর্ব্বে পার্শ্বস্থিত চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

স্থির গম্ভীরতর স্বরে শ্যাটো প্রচার করিল,—"কিন্তু তাকে যেতে হবে।"

অচল অটল ভাবে পারুল বলিল,—"সে যাবে না।"

এত বড় অপমান নীরবে সহ্য করিবার লোক শ্যাটো নহেন। বিশেষতঃ জীব বিশেষের মত পত্নীর কাছেই তাহার বীরত্ব সমধিক। ক্ষুণ্ণ মর্য্যাদা তৎক্ষণাৎ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার দৃঢ়সংকল্পে সে ভৃত্যের দ্বারা নবগোপালকে সেই গৃহে ডাকিয়া পাঠাইল।

"আমি এই দণ্ডে তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে, এই বাড়ীতে তোমার হুকুম আর চলবে না।" বলিতে বলিতে শ্যাটো দূরস্থিত চেয়ারে বসিয়া পায়ের উপর পা রাখিয়া—শ্রীপদদ্বয় প্রবল আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

আহত-অভিমানের বেদনায় পারুলের মুখ চোখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। একদিন যাহাকে সে কলের পুতুলের মত নাচাইয়াছে, সেই শ্যাটো আজি বহির্জগতে সমস্ত প্রভুত্ব হারাইয়া, স্ত্রীর সামান্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে—এবং তাহাতেই সে এতটা আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছে, এই দুঃখ চিরস্বাধীনা পারুলের অন্তরে তীব্র শেলাঘাত করিল। দলিতপুচ্ছ, উর্দ্ধফণা, ফণিনীর তেজে সে বলিল,—

"এরই নাম 'দাসবৃত্তি' Slave mentality!' যদি অভিধানে খুঁজে না পাও, জেনে রাখ—এরই নাম গোলাম চরিত্র!

"প্রজারা বিদ্রোহ করেছে, আড়ষ্ট হ'য়ে নির্জ্জীব পুতুলের মত ঘরে বসে আছ! হাতে একটি কপর্দ্দক অবশিষ্ট নাই—নীরবে হাই

তুলছ! জমিদারী নিলামে চড়েছে, বিধবার সঞ্চিত অর্থের উপর লোলুপ দৃষ্টিনিক্ষেপ কচ্ছ! অন্দর-পিঞ্জরাবদ্ধ অসহায়া স্ত্রী—তার সমস্ত স্বাধীন চিন্তাটুকু তোমার পায়ে বিসর্জ্জন কর্ত্তে পাচ্ছেনা —বীরপণা দেখিয়ে তাকে শাসাতে এসেছ, তাতে এতটুকু লজ্জা বোধ কচ্ছ না—**abject slave mentality !"**

বহির্ব্বাটীস্থ স্বীয় নির্জ্জন অন্ধকার কক্ষে নবগোপাল সেইদিন অবধি, ভীত চিন্তান্বিতভাবে কালকর্ত্তন করিতেছিল। শ্যাটোর আহ্বানে সে প্রথমতঃ চমকিত হইয়া গেল। ত্রাসে, শঙ্কায় সে কাঁপিতে লাগিল।

তাহার পর যখন সে শুনিল যে পারুলের গৃহে শ্যাটো এবং পারুলের সমক্ষে তখনি তাহার হাজির হইতে হইবে, তখন সে কথঞ্চিত আশ্বস্ত হইয়া ভাবিল,—'দিদির সঙ্গে বুঝি দাদাবাবুর ভাব হ'য়ে গেছে—তা হ'লে আর ভয়ের কারণ নাই।'

অর্থহীন সরল হাসি বদনে মাখিয়া নবগোপাল পারুলের কক্ষে প্রবেশ করিতেই শ্যাটো বলিল,—"তোমাকে এখান থেকে যেতে বলা হ'য়েছিল না?"

আশু মার্জ্জনাপ্রাপ্তির উৎফুল্ল আশায় নবগোপাল হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা—বোনাই সাহেব—না জেনে, না বুঝে, না চিনে—কি জানেন—হেঁ—হেঁ—হেঁ—" নিষ্প্রভ শুষ্ক হাসির ছায়ায় তাহার ম্লান বদনমণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

"আমার আদেশ ছেলেখেলা নয়, তা মনে রেখ!" বলিয়া শ্যাটো একটি চুরুটের মুখাগ্নি করতঃ প্রবল টানে ধূম্ররাশি উর্দ্ধে

উড়াইয়া দিয়া, সদম্ভে নবগোপালের পানে চাহিল। সেই চাহনীর বিপরীত অর্থ বুঝিয়া নবগোপাল অভিষ্টসিদ্ধির স্থিরীকৃত আশায় আবার একগাল ম্লান হাসির সঙ্গে বলিল,—

"তা, অর্থাৎ কিনা এবারটি।"

"কখনো না। এই দণ্ডে এই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও তুমি।" বলিয়া শ্যাটো আবার একগাল ধুঁয়া বাতাসের অঙ্গে নিক্ষেপ করিল।

নবগোপাল দুঃখে, বিস্ময়ে নীরবে কাঁদিয়া ফেলিল। "সে গরীব মানুষ, দিদির দৌলতে বোনাই সাহেবের আশ্রয় পাইয়াছে, নচেৎ 'মা বাপ' বলিতে এই বিশাল দুনিয়ায় আর তাহার কেহই নাই—এইবারের জন্য, নয় তাহার নাক কাণ মলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হউক।"

ইত্যাকার অনেকানেক খোসামোদ করিয়াও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ শ্যাটো সাহেবের মার্জ্জনা না পাইয়া অগত্যা বেচারী "ভেউ ভেউ" সমুচ্চ ক্রন্দননাদে বাটীময় তাহার নূতনতর বিপদবার্ত্তা জানাইয়া দিল।

সহসা পারুল প্রদীপ্ত তেজে স্বামী ও ভ্রাতার মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া তারস্বরে শ্যাটোকে বলিল,—"যদি সত্যি একে এই অসহায় অবস্থায় তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তা হ'লে আমিও আর এক মুহূর্ত্ত এই পরিবারে থাকব না জেন।"

ক্রোধে তখন শ্যাটোর কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। হিতাহিত চিন্তা না করিয়া সে বলিল,—"আচ্ছা তাই হউক—দুষ্ট বলদের চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভাল।"

পারুলের সমজাতীয়া বঙ্গ-কুল-ললনাবর্গের [illegible]হীনভাবে

অত্যাচার সহ্য করিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অতি মুখরা পারুল, বিদেশী বিধর্মীর সমাজে প্রতিপালিতা হইয়া—বঙ্গকুললক্ষ্মী-গণের সেই সর্ব্বংসহা শান্তিপ্রসবিনী শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে নাই। নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা জন্মাইবার ক্ষমতা তাহার নাই। বিশ্ব-বিধ্বংসী অভিমানের আগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া পারুল তখনই নব গোপালের হাত ধরিয়া সেই গৃহত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিল।

এমন সময় শান্তিময়ী সেইখানে উপস্থিত হইয়া, বধূর গমনে বাধা দিয়া, বিষম বিরক্তির স্বরে বলিলেন,—"এই সব কি ভুলো?

"তোমার বৌমা এখানে থাকতে চান না।" বলিয়া শ্যাটো বক্র কটাক্ষ-পাতে পারুলের দিকে ভ্রুভঙ্গী করিল।

শান্তিময়ী সকলই জানিতেন। অধিকন্তু তিনি আসিতে আসিতে ভোলানাথ এবং বধূর তর্কবিতর্কের কিয়দংশ শুনিয়া ছিলেন, তাই তিনি বলিলেন,—

"মিথ্যা কথা বলিসনি ভুলো। হতভাগা, এ বাঁধন কি এমন ক'রে ছিঁড়ে ফেলা যায়? পরের মেয়েকে ঘরে এনে হতাদর করতে নেই ভুলো, তাতে মালক্ষ্মী বিরূপ হন। তোমাকেও বলছি বৌমা, স্বামীর সেবা, তাঁর মনোরঞ্জন করাই নারীর ধর্ম্ম। মিথ্যা বিবাদ ক'রে নিজেদের শান্তি নষ্ট করোনা। আর নবগোপাল, তুমি আমাদের কুটুম্ব—সমাদরের পাত্র। বাজে কথায় থাকতে নেই তোমার; যাও, কিছু মনে ক'র না—আর কখনও কারুকে কোন কথা বলো না যেন।"

সহাস্যে নবগোপাল অন্তর্দ্ধান হইলেন। জানিনা শান্তিময়ীর ধর্ম্মোপদেশগুলি তাহার মর্ম্মে প্রবেশ করিল কিনা।

জীবনের প্রথম আজি পারুল মাসীমার উদ্দেশে মনে মনে শত প্রণিপাত করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিল। বাঙ্গালার সুগৃহিণীগণের সমুচ্চ দয়ার দৃষ্টান্ত—শিক্ষাভিমানিনী, স্বাধীনা রমণী আর কখনও দেখে নাই—দেখিবার সুযোগ পায় নাই। ত্যাগের মহিমা সে এমন করিয়া উপলব্ধি করিবার সুযোগ আর পায় নাই। তাই প্রদীপ্ত ক্রোধের মুহূর্ত্তে মহা বিপদকে বরণ করিয়া লইবার মুখে, শান্তিময়ীর আশ্রয় পাইয়া তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল।

সহসা শ্যামল ছুটিয়া আসিয়া এক লম্ফে 'ঠাকুরমার' ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া বলিল, "ঠাকুরবাড়ী যাবে না ঠাকু'মা—এতক্ষণ তারা তোমার জন্য বসে আছে বুঝি?"

ঠাকুর বাড়ীতে কথকতা হইতেছিল—শান্তিময়ী তাহার প্রধান উদ্যোক্তৃ ও শ্রোত্রী! অমনি অপর সকল কথা ভুলিয়া তিনি শ্যামলের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ী চলিয়া গেলেন।

আজিকার এই সামান্য ঘটনায় শ্যাটোর জীবনপ্রবাহ ঘোরতর বিপদের পথে চালিত করিল। পারুলের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছেদসাধনই শ্যাটোর স্থিরীকৃত সংকল্প। সেই সুযোগ মাসীমার অযাচিত করুণার প্রহারে নষ্টপ্রাপ্ত হইয়া গেল। শান্তিময়ীর কার্য্যের মধ্যে মাতৃত্বের গরিমা উপলব্ধি করিবার উদারতা—কুটিল শ্যাটোর নাই।

অবশ্যম্ভাবী পারিবারিক অশান্তির সূচনাকেই ভ্রান্ত শ্যাটো মহা সুখের অগ্রদূত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। সেই ক্ষেত্রে শান্তিময়ীর

অনধিকারচর্চ্চা সে পরমুখাপেক্ষীতার অতি তিক্ত ফল বলিয়াই ধরিয়া লইল। তাই সে শান্তিময়ীর উপর অত্যন্ত বিদ্বেষবান হইয়া উঠিল। সে মনে করিল, 'মাসীমার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছি বলিয়াই তিনি আজ আমাদের স্বামী-স্ত্রীর কথায় মাথা গুঁজিবার সাহস করিয়াছেন। হায়, হেয় অধীনতার এই ত ফল!'

ফলে, উপর্য্যুপরি অবাধ্যতা এবং কর্কশ ব্যবহারের দ্বারা ক্রমশঃ শ্যাটো শান্তিময়ীর বিপুল স্নেহ-বারিধিমাঝে প্রবল দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, বিরাগের তরঙ্গ তুফান তুলিয়া দিল।

---

(১২)

স্বামী-সঙ্গ-সুখ-বঞ্চিতা উপেক্ষিতা পারুল অতি বড় দুঃখের মধ্যে শান্তিময়ীর আশ্রয় পাইয়া, সহসা তাহার উদ্দাম জীবনের গতি প্রশমিত করিবার সুযোগ পাইল।

শ্যাটোর তথা-কথিত ভালবাসার উচ্ছৃঙ্খল অভিনয়কালে, উদ্দাম অবসাদের ঘোরে পারুল একপ্রকার উষ্ণ উত্তেজনায় দিন কাটাইত। কিন্তু রমণীর সর্ব্বোচ্চ গৌরব—স্বামীসোহাগে বঞ্চিতা হইয়া দারুণ উপেক্ষার বেদনায় যখন পারুল অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে নামিয়া যাইতেছিল, সেই স্বর্গ-নরকের সংযোগ স্থলে মাতৃত্বের অমৃত-আস্বাদ পাইয়া পারুল বিরাট মঙ্গলের পথে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

যেই শান্তিময়ীকে পারুল এক দিনের জন্যও তাঁহার ন্যায্য মাতৃত্বের আসন প্রদান করে নাই—বরং নিয়ত নানাবিধ দুর্ব্যবহারে যাঁহার হৃদয়ে সে নিয়ত প্রবল আঘাত করিয়া আসিয়াছে—সেই শান্তিময়ী যখন চরম হতাশার মুহূর্ত্তে তাহাকে পূর্ণ মাতৃত্বের স্নেহ-ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন—সেই দণ্ডে পারুলের অন্তর মধ্যে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল।

ক্রমে শান্তিময়ী নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া পারুলকে সত্য গৃহলক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পারুলও জীবনের প্রথম মাতৃস্নেহের পবিত্র স্পর্শ পাইয়া কিছু দিনের মধ্যেই শান্তিময়ীর একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িল।

সেবা, পরিচর্য্যা এবং সুমধুর আপ্যায়নে সে অল্পদিনের মধ্যেই শান্তিময়ীর সমস্ত স্নেহরাশি আয়ত্ব করিয়া বসিল।

বধূ ভিন্ন শান্তিময়ীর এখন আর এক মুহূর্ত্তও চলে না—পারুল একাধারে শান্তিময়ীর কন্যা ও শিষ্যারূপে মুখোপাধ্যায়-পরিবারে অধিষ্ঠান করিতে লাগিল।

আর পারুলের সেই অহঙ্কার, স্বাধীন উদ্দাম ব্যবহার, রুক্ষ ভাষা, কিছুই নাই। শান্তিময়ীর উদারতার সংস্পর্শে পারুলের রমণী-সুলভ সুমধুর মঙ্গলবৃত্তিগুলি একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। অচিরে আদর্শ বঙ্গকুললক্ষ্মী-রূপে সে সেই গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইল

পক্ষান্তরে গ্যাটো—শান্তিময়ীর মাতৃত্বের প্রভাব এবং পারুলের সহিত দাম্পত্য সম্বন্ধের অন্ধ মাদকতা—উভয় আকর্ষণ হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া গিয়া, অধুনা সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খলতা আশ্রয় করিয়া বসিয়াছে।

আবার শ্যাটো এত মাত্রায় মদ্যপান আরম্ভ করিয়াছে যে, অষ্টপ্রহরের মধ্যে এক দণ্ড তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। মদ্যপ-সুলভ অন্যান্য সকল পাপগুলিই আবার তাহাকে আশ্রয় করিয়া বসিয়াছে।

শান্তিময়ী নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও শ্যাটো ও পারুলের মধ্যে পুনরায় সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারেন নাই।

স্বভাবতঃ উদার স্নেহময়ী তিনি। সর্ব্বদা সকল কার্য্যই তিনি অতিশয় সরলতার সঙ্গে করিয়া থাকেন। তাই সুকৌশলে যেই কার্য্য সহজসাধ্য হইত শান্তিময়ীর চতুরতা-বিহীন সরল চেষ্টায় সেই কার্য্য পণ্ড হইতে বসিয়াছে।

নারী, নারীর দুঃখ যেমন করিয়া বোঝে অপরের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। বধূর প্রতি শ্যাটোর তাচ্ছীল্যের ব্যবহারে তাই শান্তিময়ীরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়া দিয়াছে। বার বার বিফলমনোরথ হইয়া শান্তিময়ী পুত্রাধিক স্নেহেরপাত্র শ্যাটোর প্রতিও সহানুভূতিশূন্য হইয়া পড়িতেছেন।

* * * *

জগদিন্দুর সংসর্গে আসিয়া উচ্চহৃদয়া শান্তিময়ী তাহার উচ্চ-আদর্শের পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িয়াছেন। জগদিন্দুর ঐকান্তিক চেষ্টা এবং স্বার্থত্যাগের ফলে এক বৎসরের মধ্যেই পারিপার্শ্বিক পল্লী ও পল্লীবাসীর অপ্রত্যাশিত শ্রীবৃদ্ধি সন্দর্শনে, তিনি শ্যাটো অপেক্ষা জগদিন্দুকেই অধিকতর স্নেহেরপাত্র বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছেন।

গলিত তুষাররাশি যখন নিম্ন পথে সাগর উদ্দেশে ধাবিত হয়—তখন তাহার পথের বিচার থাকে না। অনন্ত, মুক্ত সাগরের সহিত মিলিত হইতেই সে চাহে—তাহাতেই তাহার চরম আনন্দ। এখানে বাঁধিয়া দেও, অন্য সুগম পথে সে গা ঢালিয়া দিবে।

সেই প্রকার, স্বভাবতঃ উদার যাঁহারা, তাঁহাদের পূত স্নেহধারাও এক অনন্তের পথে বহিয়া যায়। একস্থানে বাধা পাইলে সুগম পথান্তর বাছিয়া লইতে তাঁহাদের বিলম্ব হয় না। শান্তিময়ীর উথলিত স্নেহধারাও যখন শ্যাটোর মধ্যে ব্যর্থতার বাধাপ্রাপ্ত হইল, তখনই তাহা পারুল এবং জগদিন্দুর ভিতর দিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অনন্ত লক্ষ্যের পথে ছুটিয়া চলিল।

পক্ষান্তরে শ্যাটো, জগদিন্দু এবং পারুল উভয়ের প্রতি---বিভিন্ন কারণে হইলেও সমানভাবেই বিদ্বেষপরায়ণ। জগদিন্দু তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী—অতএব শত্রুপদবাচ্য। পারুল তাহার ভবিষ্যৎ সুখের অন্তরায়।

শ্যাটো যখন দেখিল যে, মাসীমা ধীরে ধীরে ইহাদেরই পক্ষাশ্রয় করিতেছেন, তখন নিজের হিতাহিত ভুলিয়া সে মাসীমাতার উপরই প্রবল বিদ্বেষের ভাব দেখাইতে লাগিল।

গৃহবিবাদে জমিদারীর শাসনসমস্যা ক্রমে জটিল হইয়া পড়িতেছে, শ্যাটো ভ্রূক্ষেপও করিলনা। সেইদিন জমিদারীসংক্রান্ত হিসাবপত্র দেখিতে দেখিতে সে দেখিল অনন্তদেব এবং নবগোপাল দুইজনে মিলিয়া কিছু টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে।

অমনি সর্ব্বজন-সাক্ষাতে সে দুইজনকেই দ্বারবানের দ্বারায়

সবিশেষ অপমানিত করিতে কুণ্ঠাবোধ করিল না। ফলে, অনন্তদেব কর্ম্মে ইস্তাফা দিয়া গিয়াছে। দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া নবগোপালও তাহারই বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

শ্যাটো নানা প্রকারে অনন্তদেবের হাতে জড়িত। অনেক বিপদ-জনক কাগজপত্র তাঁহারই হাতে রহিয়াছে। তথাপি, পক্ষোন্মীলিত পতঙ্গবিশেষের মত, হিতাহিত জ্ঞানহীন মন্থপ, সেই অনন্তদেবকেই অপমানিত করিয়া কর্ম্মচ্যুত করিতে দ্বিধা বোধ করিল না।

সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া শান্তিময়ী ঝটিতি তাঁহার কর্ত্তব্য নিদ্ধারণ করিয়া লইলেন।

দেশাত্মবোধ একবার যাঁহার প্রাণে জাগরিত হয়, সকল বিশ্বই তাঁহার আপন হইয়া যায়। হীন স্বার্থচিন্তা, দৈহিক আরাম, আকাঙ্ক্ষা, পদ-প্রতিষ্ঠা, গৌরব, সকলই ব্যষ্টি ছাড়িয়া সমষ্টিতে পর্য্যবসিত হয়।

মহান ভাবতরঙ্গ সমান ভাবে শান্তিময়ী এবং পারুলের হৃদয়ে উথলিয়া উঠিয়াছে—কাজেই পারুল শান্তিময়ীর ইচ্ছার পূর্ণ সমর্থন করিল।

আজি শান্তিময়ী একটা শেষ চেষ্টার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া বধূকে পার্শ্বে ডাকিয়া বসাইলেন। অবিলম্বে শ্যাটোকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সংবাদ দিয়া তিনি বধূকে বলিলেন,—

"ভগবানে বিশ্বাস হারিওনা মা। পুণ্যের সংসারে পাপের স্পর্শ লেগেছে—তবু স্থির জেন আবার এই সংসারে পূর্ব্বের শান্তি ফিরে আসবে। ঝড় বাদলার পর আবার পৃথিবী রৌদ্র আলোকে ভরে যায়—এর ব্যতিক্রম হয়না মা।"

ভক্তি-বিনম্রস্বরে পারুল বলিল,—"একটা উদ্দাম চপলতার আবল্যে জীবনের সার ভাগটা অযথা কাটিয়ে দিয়েছি—সংসারের কোনও দাবীই কাণে তুলি নাই। কিন্তু সেই ভুলের ঘুম ত ভেঙ্গে গেছে মা। তোমার স্নেহস্পর্শে জেগে উঠেছি যখন—মা বলে তোমায় একবার চিনেছি যখন—আর আমায় অবিশ্বাস করো না।"

শান্তিময়ী জানিতেন পারুলের জীবনপথের সত্যই একটা বৃহৎ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যেই পারুল একদিন শিক্ষা এবং ঐশ্বর্য্যের মোহে সম্পূর্ণ বিদেশী—বিধর্ম্মীর ধাঁচে শ্যাটোর 'বাঙ্গালায়' বিহার করিত, সেই পারুল আজি শাঁখা, শাড়ী আর সীমন্তের সিন্দূর মাত্র সার করিয়া পবিত্র হিন্দু সমাজের আদর্শকুলবধূর জীবন যাপন করিতেছে। ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, তাহার প্রাণের সমস্ত মলিনতা বিদূরিত হইয়াছে।

যাহা হউক, শান্তিময়ী বলিলেন—"ভুলোকে ডেকে পাঠিয়েছি মা। যেমন প্রবল ব্যাধি, বোধ হয় তেমনই উগ্র ওষুধ প্রয়োগ কর্ত্তে হবে। তাতে ক্ষুণ্ণ হ'ও না। সত্যই যখন দেশটা এবার সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে মুছে ফেলে—আবার পূর্ব্বশ্রী, পূর্ব্বগরীমা, ফিরিয়ে পাবার পথে এসেছে—সেই অবস্থায় ওর কদাচারের প্রশ্রয় দেওয়া মহাপাপ।

"আমার পিতা, পিতামহের জন্মমাটি যদি আজি সমস্ত বাঙ্গালার সম্মুখে এমন একটা উচ্চ আদর্শ খাড়া করে দিতে পারে—তার চেয়ে গর্ব্বের বিষয় আর আমাদের কি হ'তে পারে মা?"

"নিঃসঙ্কোচে তোমার কাজ তুমি করে যাও মা। আমায় সুধু

পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো—যেন আমি তোমার ছায়ার সঙ্গে মিশে চলতে পারি।" বলিতে বলিতে পারুল জলভরা চক্ষু দুইটি মাটিতে নিবদ্ধ করিয়া, নিজের পূর্ব্বকৃত অপরাধের কথা ভাবিয়া কাতর হইয়া পড়িল।

ক্ষণপরে সুরাবিহ্বল কম্পিতচরণে, দীনতার কঙ্কাল খ্যাটো সেইখানে উপস্থিত হইয়া বলিল—"আমাকে কেন তলপ করেছ তোমরা?"

খ্যাটোর কথার ভঙ্গী এবং শারীরিক অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া শান্তিময়ী বিষম ঘৃণায় মনে মনে জ্বলিয়া উঠিলেন। কোনমতে আত্মসংযত হইয়া তিনি বলিলেন,—

"ভুলো যা করেছিস না করেছিস সব ভুলে যা। যদি নিজের ভাল চাস—এখনও আমার কথা শুনে ফিরে দাঁড়া। একেবারে চরমে এসে দাঁড়িয়েছিস, আর এগুতে গেলে কোথায় পড়ে যাবি তা ভেবে দেখ।"

"তোমার কথা ছাড়াও এতদিন স্বাধীনভাবেই বিষয়রক্ষা করে আসছিলেম—একথা স্বীকার কর বোধ হয়?" বলিয়া খ্যাটো শান্তিময়ীর প্রতি দারুণ উপেক্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

খ্যাটোর নিকট এমন ব্যবহার শান্তিময়ীর পক্ষে নূতন নহে। কিন্তু আজি শান্তিময়ীর প্রবল স্নেহধারা অনন্ত ভাবসমুদ্রের পথ চিনিয়া লইয়াছে। খ্যাটোর অবজ্ঞার সুরটা তাই তাহার প্রাণের তন্ত্রী ছিঁড়িয়া দিবার উপক্রম করিল। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"তাই যদি হয় তবে কেন আমার পিতৃপুরুষের সাজান নৌকা বিনামেঘে বানচাল হতে বসেছে ভুলো?"

"তোমারই নিশ্চেষ্ট ব্যবহারে।" বলিয়া শ্যাটো আবার শান্তি-ময়ীর ক্রোধাগ্নিতে ইন্ধন নিক্ষেপ করিল।

স্থিরকণ্ঠে, দৃঢ়ভাবে শান্তিময়ী বলিলেন,—"তা নয় ভুলো। এতদিন গ্রহ ছিল তোর সহায়—তাই তোর পাপের কার্য্যও সফল হ'য়েছে। আর আজ বিষম কুগ্রহ তোকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে—অন্ধের মত সেই অধঃপতনের পথেই চলেছিস তুই। এতদিন তোর সুদিন ছিল, তাই কোন কথা কইনি—ক্রমে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিস—যাতেক'রে আর কথা না কয়ে থাকতে পারি না।"

ক্ষণকালের জন্য নীরব থাকিয়া শ্যাটো শান্তিময়ীর নিভাঁজ সত্য কথাটার মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তখন তাহার ফাঁকা মস্তিষ্কে ধারণা-শক্তি ছিল না। তাই অর্থহীন আত্মপ্রবঞ্চনাবশে সে বলিল,—

"আরও কিছুদিন যদি নীরবে থাকতে পার—দেখবে ধীরে সুস্থে, র'য়ে বসে সবই হবে।"

মূর্খ আত্মপ্রবঞ্চিতের মামুলি প্রবোধবাক্য শান্তিময়ী অনেক শুনিয়াছেন, তাই তিনি বলিলেন,—

"বড় বড় বাঁধাবুলি আওড়ালেই কাজ হয় না ভুলো। ঘরের চালায় যখন আগুণ জ্বলে ওঠে—বুঝে সুজে তার প্রতীকার করা চলে না! ছেলে যদি পাতকূয়োয় পড়ে যায়—তখন ভাবনাচিন্তার অবসর থাকেনা ভুলো!"

শ্যাটোর মস্তিষ্কে কথাগুলি প্রবেশ করিল কি না জানি না।

অসংবদ্ধ অর্থহীন পরিকল্পনার প্রবাহে ডুবিয়া সে নীরব রহিল। ক্ষণপরে শান্তিময়ী আবার বলিলেন,—

"বৎসরাধিক প্রজারা বিদ্রোহ করেছে। গুরু, পুরোহিত, স্বজন, জ্ঞাতিবর্গ সকলে এই বাড়ীর সংস্রব ত্যাগ করেছে। গ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ হ'য়ে, আজি তুই সর্ব্বনিম্নে সকল রকম পাপের আবর্ত্তে হাবুডুবু খাচ্ছিস্? অথচ জগত, সর্ব্বস্ব হারিয়েও আজ গোটা দেশটার একচ্ছত্র রাজচক্রবর্ত্তী—সর্ব্বত্যাগী হ'লেও লক্ষ উন্মুক্ত হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তার বিরাট সাম্রাজ্য।"

জগদিন্দুর কথা শুনিয়া শ্যাটো "তেলে বেগুনে" জলিয়া উঠিল। "এত বড় মহাত্যাগী, মুক্ত পুরুষ যদি তিনি—তা হ'লে জোঁট্‌টা বাঁধালেন কেন? কাড়ে পড়ে কৌপীন সার করে অনেকে—তা ব'লে মহাপুরুষ বনে যায় না।"

এতক্ষণ পারুল নীরব ছিল। জগদিন্দুর প্রতি অশ্রদ্ধায় কটাক্ষে সে বিরক্তির স্বরে বলিল,—

"জোঁট তিনি বাঁধান নাই। প্রজাদের খাজানা দিতেও তিনি বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্য সকল কথাই তারা শোনে—শুধু একথা তারা শোনেনা। বলে—"ছোটবাবুর বিষয় ফিরিয়ে দেবে, তবে খাজানা দেব।"

শ্যাটো জানিতনা যে, ইহারই মধ্যে পারুলের কত বড় একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। পারুল জনমতের পক্ষাবলম্বন করিয়াছে, এ কথাও সে জানিত না। ক্রমে কথাবার্ত্তায় সে বুঝিল যে শান্তিময়ী এবং পারুল উভয়েই জগদিন্দুর বিরাট পল্লীসংস্কার-

ব্রতে সহায়তা করিতেছে, এবং তাঁহাদের ইচ্ছা শ্যাটোও জগদিন্দুর বশ্যতা স্বীকার করে। ঈর্ষা, অভিমান এবং অসূয়াপরবশ শ্যাটো অমনি বলিয়া উঠিল,—

"বেশ তা হলে আমি একলাই শেষ অবধি দেখব, তবু শত্রুর পায়ে মাথা নোয়াতে পারব না জেন।"

অসীম ধৈর্য্যশালিনী শান্তিময়ী তথাপি স্থিরকণ্ঠেই বলিলেন,—

"মোকদ্দমায় কোন ফল হবে না ভুলো। দশ টাকার খাজনার জন্য, দশ টাকার বেশী খরচ ক'রে—ডিক্রী পেয়েছিস। 'কলকাকাটা' সহিমোহরের ছাপমারা ফাঁস্ কাগজ আলমারীতে পোকায় কাটছে, টাকা উশুল হয় নাই তাতে। মামলা লড়ে জয়ী হয়েছিস বটে, কিন্তু দেশের কাছে, দশের কাছে যেই হীন পরাজয়ের কালি মুখে মেখেছিস—তাতে সেই কালি আর ঘুচবে না জানিস্।"

মিথ্যা গর্ব্বে বক্ষ স্ফীত করিয়া শ্যাটো সদম্ভে উত্তর করিল,—"এই মূর্খ দেশের জনমতের কোন মূল্য নাই। আমি একা এই পদদলিত দেশের মথিত কঙ্কালের উপর মাথা উঁচু কোরে দাঁড়িয়ে আছি—দেখে গ্রাম্য চৌকীদার থেকে কোম্পানী বাহাদুরের সর্ব্বোচ্চ প্রতিনিধি পর্য্যন্ত আমাকে ধন্য ধন্য কর্চ্ছেন। বচনসর্ব্বস্ব জাতির ব্যর্থ বাচালতার চেয়ে, রাজার জাতির আশীর্ব্বাদই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।"

অতি দুঃখেও শান্তিময়ীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। এতদিন তিনি এই আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানহীন মূর্খের জন্য তাহার অফুরন্ত স্নেহ-ভাণ্ডার, অন্ধের যুক্তি তর্কের অতীত বিশ্বাসের সঙ্গে, উন্মুক্ত রাখিয়া-ছিলেন—ভাবিয়া তীব্র অনুশোচনায় তাঁহার প্রাণ ভরিয়া গেল।

"কোম্পানী বাহাদুর মুর্খ নয় ভুলো—তা হ'লে সাত সাগর-পার হ'তে দোকান কর্ত্তে এসে বিশাল সাম্রাজ্য জয় কর্ত্তে পার্ত্তেন না তাঁরা। লক্ষ ব্যথিত নরনারায়ণের মিলিত কণ্ঠের আবেদন উপেক্ষা ক'রে যেই পাষণ্ড, পিঠচাপড়ানিকেই সংসারের সার সুখ ব'লে জ্ঞান করে, একটা প্রবল বীরের জাতি তাদের মূল্য জানেনা—একথা মনে করিস না।

"স্বদেশবৎসল তাঁরা—জনমত তাঁদের কাছে অলঙ্ঘনীয় দেবা-দেশের মত গ্রাহ্য—তাঁরা তোদের মত হীন খোশামুদের মুরদ ভাল কোরেই জানেন!

"কুক্কুর-বৃত্তিই যেই মানুষের শ্রেষ্ঠ অহঙ্কার, সেই মানুষকে—মানুষ যাঁরা, তাঁরা কুকুরের চেয়েও হেয় জ্ঞান করে জানিস। কার্য্যোদ্ধারের জন্য মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে কাজ হাসিল করে, তারপর জুতোর ঘায়ে বুঝিয়ে দেয়—যে তাঁরা বীরের জাতি!"

মুহূর্ত্তের জন্য একটা পবিত্র নিস্তব্ধতায় সমস্ত কক্ষ আপ্লুত হইয়া রহিল। শ্যাটো আর সেই গরীয়সী রমণীর মুখের উপর কোনও কথা কহিতে পারিল না। নীরবে সে সেই কক্ষ ত্যাগ করিবার প্রয়াস করিলে, শান্তিময়ী সুদৃঢ়স্বরে বলিলেন—

"আমার কথার উত্তর চাই ভুলো।"

শ্যাটোর মাথায় তখন 'খুণ চড়িয়াছে' সহসা সে উত্তর করিল,—"শত্রুর পক্ষাশ্রয় করেছ তোমরা—তোমাদের সঙ্গে আর আমার কোনও সম্পর্ক নাই। আমার বিষয় শীঘ্রই বক্‌রা কোরে নোব আমি।"

আবার একটা প্রবল চেষ্টায় নিজের উত্তেজিত চিত্ত সংযত করিয়া শান্তিময়ী বলিলেন,—

"বড় যত্নে বার বছর ধ'রে তোকে পুত্রের আসনে বসিয়ে, নিজে তোর অধীন হয়ে চলেছি ভুলো—স্নেহের চেয়ে স্বার্থ বড় নয়—তাই। আমি জানি, আমার কথা তোকে শুনতে হবে—কিন্তু সেই আঘাতটা আর করতে চাইনা।"

"অনেকবার এমন কোরে অযথা ভয় দেখিয়েছ আমায়। এটা ঠিক মাতা-পুত্র-সম্বন্ধের উপযুক্ত কাজ নয়।" বলিয়া জঘন্য হাসিতে নিজের মুখপটে একটা পশুত্বের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়া গ্যাটো, আবার ে ই ঘর ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল।

সকল ধৈর্য্যের বাধা অতিক্রম করিয়া অমনি শান্তিময়ী বলিলেন,— "শোন ভুলো—বাবার বিষয়ে তোর কোনও অধিকার নাই, সমস্ত বিষয়ই আমার।"

কথাগুলি গ্যাটোর কাছে একটা প্রকাণ্ড উপহাসের মত মনে হইল। কুটিলতাপূর্ণ ব্যঙ্গ হাস্যের সহিত সে বলিল,—"নিশ্চয়, তুমি আমার মাতৃতুল্য—মা বেঁচে থাকতে আইন পুত্রকে বিষয়ের অধিকার দেয় বটে—কিন্তু তা নীতিসঙ্গত নয়—তা আমি মানি।"

কথাটার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে শান্তিময়ীর বিলম্ব হইল না। সমান দৃঢ়তার সহিত তিনি আবার বলিলেন,—"নীতি-শাস্ত্রের অনুজ্ঞা নয় ভুলো—এই নে, পড়ে দ্যাখ্।"

বলিয়া শান্তিময়ী প্রবেটসহ তাঁহার পিতার উইলখানা একটি দেরাজের ভিতর হইতে বাহির করিয়া গ্যাটোর হস্তে দিলেন।

উইলের কিয়দংশ পড়িয়াই শ্যাটোর চমক ভাঙ্গিয়া গেল। একটা দারুণ ব্যথায় তাহার মস্তিষ্ক বেকল করিয়া দিল। অভিমানে দলিলগুলি কক্ষতলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শ্যাটো, বেগে সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল।

তাহার মুখের ভাব ভাল রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পারুলের হৃদয় সহসা দ্রুত স্পন্দন করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, যেন তাহার ইহকাল পরকাল সমস্ত একত্রে সেই মুহূর্ত্তে একটা গভীর অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল।

শান্তিময়ী দেখিলেন, যেই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি শ্যাটোর কাছে এই তিক্ত সত্য কথাটা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন—তাহার কার্য্যফলে—তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল।

তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'হীন স্বার্থপর যুবক এই নির্ঘাৎ কথাটা শুনিলেই অচিরে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবে!' কিন্তু শ্যাটোর মুখভাব দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, একটা দারুণ আঘাতে তাহার হৃদয় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সস্নেহ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া প্রিয়তমা বধূকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া স্নেহময়ী, বিগলিত অশ্রুধারে পারুলের মস্তক সিক্ত করিলেন। রুদ্ধ আবেগে পারুল কাঁদিয়া কাঁদিয়া দ্বিগুণ বেদনায় অধীর হইয়া পড়িল।

স। পল্লীর পথ ঘাট ছাড়িয়া বর্ষার জল আবার
ল, ঝিলের—তীরের তলায় নামিয়া গিয়াছে। দিনকর
নীল আকাশের কোলে আরোহণ করিতেছেন।
য় ধরণীর কুমকুম-রাঙ্গা অঙ্গরাগ—শ্যামল স্বচ্ছ তড়াগের
ত হইয়া তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। যেন—
চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া, পৃথিবী সুন্দরী আবার তরুণীর
দ হাসিয়া উঠিয়াছে।

—পদ্ম, সেফালীগন্ধ আজি শরতের পরিপূর্ণ গর্ব্বে
র্ণতা জাগাইয়া তুলিয়াছে।

বিরহ-বিধুরা পল্লীবধূ, কলসী কাঁকে ঘাটে যাইবার পথে
লে, আড়নয়নে পথগামী নৌকা শ্রেণীর মধ্যে একবার
ান করিয়া লইতেছে। প্রাতঃসন্ধ্যা, নিশীথ-প্রভাতে
ঙ্গ নৌকাবক্ষ হইতে পল্লীমাতার প্রাণে পুত্রের গৃহাগমন
করিতেছে।

উন্মাদনাময় আশ্বিনের, এক সুন্দর প্রভাতে ক্ষুদ্র
সোণামুখীর শিশিরধৌত ঘাটের কোণে বসিয়া
ামী সহস্র নৌকাযাত্রীর প্রাণ মাতাইয়া সপ্তম সুরে

আজি কি মোহন সাজে—
সোণার বরণী, জননী ধরণী,—
দাঁড়ালে হৃদয় মাঝে।

সেই মুহূর্ত্তে ঘাটের অন্য প্রান্তে নিবিষ্টচিত্তে নবগোপাল ও অনন্তদেব খ্যাটো সাহেবের সপিণ্ডকরণের নির্ঘণ্টপত্র প্রণয়ন করিতেছিল,—

"বলে যার জন্য সিঁদ কাটা, সে-ই বলে চোরা বেটা! বেইমানের মাথায় পয়জার ঝাড়ি কুড়ি গুণে!" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ অনন্তদেব কুঞ্চিত ললাট-প্রান্তে আঁখি-পদ্ম উত্তোলন করিয়া বিকশিত দন্তপাটি অধর অভ্যন্তরে লুকাইলেন।

নবগোপাল হিংস্র জন্তু বিশেষের মত ব্যর্থ জিঘাংসার শূন্য দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বলিলেন,—"বল কেন দাদা! নৈলে আমি হলেম সম্বন্ধী অর্থাৎ কি না—"

বলিয়া নবগোপালবাবু ইচ্ছানুরূপ বাক্যচয়নে অপারগ হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

অমনি অনন্তদেব—"শ্বশুরের পিণ্ডাধিকারী" কথা কয়টি যথোচিত উপস্থিত বুদ্ধির সহায়তায় জুড়িয়া দিলেন।

নবগোপাল, "সেই আমাকেও কিনা গলা ধাক্কা?" বলিয়া কথাটা শেষ করিয়া, অতি দুঃখে নীরব হইলেন।

এবম্প্রকার ভূমিকা করিয়া তাঁহারা গভীর বেদনাভার পরস্পরের কাছে বিবৃত করিতে লাগিলেন।

অনন্তদেব, যিনি আভুঁড়ি দেহখানা পাত করিয়া, পরকাল

পর্য্যন্ত নরকের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া, ভোলানাথের জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণ এবং বর্দ্ধিতায়তন করিয়া দিয়াছেন—অবশেষে সামান্য কয়টা টাকা, যাহা তাহাকে হাতে ধরিয়াই ভোলানাথের দেওয়া উচিত ছিল—তাহার জন্য দরোয়ান সাহায্যে গলাধাক্কা প্রদানে তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াই ভোলানাথ ক্ষান্ত হয় নাই; উপরন্তু অপমান করিবার ভয়ও দেখাইয়াছেন!"

এই আপশোয রাখিবার স্থান অনন্তদেব খুঁজিয়া পাইলেন না।

নবগোপালও বলিলেন,—'তিনি হলেন একটা মান্যিমান কুটুম্ব লোক, তথাপি তিনি ভোলানাথের পাদুকানিয়ে ইঁদুরটির মত খাটিয়া দেহপাত করিয়াছেন, তাহারও কিনা অবশেষে এই হ'ল! দানাপানীর বরাদ্দ পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত!"

অতিশয় অভিমানে নববাবু—"এমন বোনাইয়ের গুষ্টির মুখে" এক প্রকার অভক্ষ্য বস্তু তুলিয়া দিবার কথা বলিতেছিলেন, অমনি অনন্তদেব বাধা দিয়া বলিলেন,—

"রাধে কৃষ্ণ! বড় ত একটা মানুষ, তার জন্যি আবার কটু দিব্যি।"

কিই বা এমন দুলাখ দশলাখ টাকার ব্যাপার! তবে হ্যাঁ, 'লাঠালাঠী ঠেঙ্গাঠেঙ্গী' করিয়া দুইদশ হাজার টাকা যাহা তাঁহাদের হাতস্থ হইয়াছে, তাহা জেবস্থ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কেনই বা হবেন? শাস্ত্রেই ত আছে 'সর্ব্বতোভাবে নিজেকে রক্ষা করিবে।' তাতে বাপু তোমার নজর দেওয়া কেন? মাসীমার পুত্র তুমি, এমন ক্ষুদ্রনজর কি তোমার শোভা পায়?"

এবম্প্রকার বহু গবেষনান্তে নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কি করা যায় বল দেখি দাদা, তুমি হচ্ছ একটা বুদ্ধিবাজ মুনিষ্যি!"

স্থির গম্ভীরভাবে অনন্তদেব বলিলেন,—"আর করাকরি নেই বাবা! এই চল্লেম ঠাকুরবাড়ী—রাত দিন হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে হয় তাও থাকবো। তবু ছোটবাবুকে আবার গদিতে বসাব, তবেই আমার নাম অনন্ত শর্ম্মা।"

কর্ম্মকুশল বৃদ্ধের কণ্ঠে এমন একটা একাগ্র দৃঢ়তার সুর বাজিয়া উঠিল—যাহাতে নবগোপাল সবিশেষ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন।

অতিশয় আনন্দে নবগোপাল বলিল,—"তা হ'লে আর দেরী করা নয়। যদিস্যাৎ বেটাচ্ছেলে আগে ভাগে গিয়ে একটা রফা সফা করে ফেলে, তা হ'লেই কিন্তু—"

মস্তক কণ্ডুয়ন করতঃ নবগোপাল একটা উপমা খুঁজিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে লাগিল। অমনি—

কবরী বাঁধিতে, পয়োধর তেয়াগি'—
আঁচল লুটাওল ভূমে।

গাহিয়া, সুমধুর সুরসংযোগে ভজহরি, নবগোপালের সমস্যার পাদপূরণ করিয়া দিয়া—হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

"ঠিক বলেছ শ্যালা বাবু" বলিয়া গলা শানাইয়া ভজহরি আবার গাহিল,—

নিরজনে আনমনে গাঁথিছিনু হার—
শিথিল কবরী—বাস খসল হামার;

তৈখনে গোপনে আঁখি চাপি কান্ত—
শিরে শত সুমধুর চুমে ;
কবরী বাঁধিতে, পয়োধর ভেরাগি'—
আঁচল লুটাওল ভূমে ।

"ঠিক বলেছিস দাদা । ভজহরি তখনি আবার গান ধরিল,—

কুল ছাড়ি সই শ্যাম সায়রে—
দিনু যবে ঝাঁপ ;—
কালা কোথা গেল, বুকে হলাহল—
ঢালিল কলঙ্ক সাপ ।

ভজহরির এবম্প্রকার অযাচিত বাহুল্যচর্চ্চায় বিরক্ত হইয়া নবগোপাল বলিল,—

"যা বেটা পাগলের ডিম । দুর্গা বলে যাচ্ছি একটা শুভকাজে কোত্থেকে হ্যাঙ্গাম জুড়ে বসল ত্যাখ ।"

ভজহরি অপ্রতিভ হইবার পাত্র নহে । "তাই ত' সখীসম্বাদটা শুনিয়ে দিলেম দাদা—এই পিরীতের নাটকে ত শেষ নাকের জলে চ'খের জলে এক না হয়ে যায় না ।"

বলিতে বলিতে সে আবার একটা গোষ্ঠ বিহারের দোঁহা আবৃত্তি করিবার উপক্রম করিল । অগত্যা অনন্তদেব—বুকভরা অনুরাগভরে সুমধুর স্বরে বলিল,—

"হ্যাঁ বাবা ভজহরি ! তোমার মাসীমার কাছে একবারটি ঘুরে এসো ত বাবা । সে কিনা খাবার নিয়ে কত ডাকছে তোমায় !"

"আহা, বেচারী! ঘরের পাগল বাঁধতে পারে না—পরের পাগলের তরে টান কত!" বলিতে বলিতে ভজহরি আবার গান ধরিল।

দ্বিরুক্তি না করিয়া—বাকি কথা গুলি যাইতে যাইতে রাস্তায় বলা কওয়া করিয়া লইবার ভরসায়, যুগল মূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান হইলেন। আপন মনে গান সমাপ্ত করিয়া ভজহরি অর্দ্ধপরিস্ফুট স্বরে বলিল,—"যাবে না? পরেশ পাথর না ছুঁলে সোণা বন্‌বে কি করে?"

এমন সময় শ্যামল ও দয়িতা দিব্য ফুলের মালা পরিয়া কদম্ব কুসুম আহরণার্থ সেখানে উপস্থিত হইল।

"ওরে ছোঁড়া ছুঁড়ী ছুটে চল—ছুটে চল, পূজো দেখতে যাবি না?" বলিয়া ভজহরি শ্যামলের সমিপবর্ত্তী হইল।

"পালিয়ে চ'—পালিয়ে চ'—নইলে পাগলা দাদামশায় আবার বিয়ে কোরে ফেলবে কিন্তু।" লাজ-চকিতভাবে দয়িতা দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

"নারে পাগলী, আর বিয়ে কর্ব্ব না তোকে। রাঙ্গা বরটি ত' তোর—সেজে গুজে, তোর আঁচল ধারেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে রে। তার সাধের গোয়াল শূন্যি ক'রে পাগলার খেয়াল যোগাতে পারবি কেন তুই?" বলিয়া ভজহরি অপার্থিব আনন্দে বিহ্বল হইয়া উর্দ্ধের দিক সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

দয়িতা আবদারের স্বরে বলিল,—"দুষ্টুমির কথা কইবে ত' তোমার গাঁজার কলকে ভেঙ্গে দেব কিন্তু।" কথা কয়টার মধ্যে সদ্যস্ফুরণশীল কৈশোর-লজ্জার প্রথম ললিত-ঝঙ্কার স্পষ্ট বাজিয়া উঠিল।

"তা দে ছুঁড়ী দে। আর কি গাঁজা খাবরে ছুঁড়ী? দেশ জুড়ে কেমন জমাট নেশার কাঁশর শঙ্খ বেজে উঠেছে—গাঁজা খেলে সেই আমেজটা ভেঙ্গে যাবে যে!" বলিতে বলিতে ভজহরি এক লম্ফে কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করতঃ রাশিকৃত ফুল্ল কুসুম পাড়িয়া আঁচল পূর্ণ করিল।

"হ্যাঁ দাদাবাবু, কোথায় পূজো হবে বল্লে না?" বলিয়া শ্যামল ভজহরির হাতে হাত মিলাইল,—

"ওহো! ভুলে গিছনু! পূজো হবে মিলন ঘরে, মায়ের পূজো হবে—মহাবলির বাদ্য বেজে উঠেছে শুনছিস না? চল নেচে নেচে—গেয়ে গেয়ে পূজো দেখবি চল।" বলিয়াই ভজহরি সোল্লাসে গাহিল,—

আজি মিলন-মন্দির দ্বারে
চল ছুটে চল পল্লী নিবাসী, লয়ে ফুল ভারে ভারে॥

(১৪)

পল্লী জুড়িয়া মাতৃ-পূজার বোধন-বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। প্রতি পল্লীগৃহে আনন্দের উৎস বহিয়া যাইতেছে।

এমন আনন্দের দিনেও অনুশীলার প্রাণে শান্তি নাই। আজি সাতদিন ধরিয়া সে মাতা সত্যভামার আগমন প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিয়াছে, কিন্তু মা আসিলেন না। ব্যর্থ আশার ব্যথায় তাই পতি-পরায়ণা সাধ্বী, কাশীযাত্রার জন্য জগদিন্দুকে শতবার অনুরোধ করিয়াছেন।

জগদিন্দুর এক কথা! "অকাল বোধনের ফল ভাল হয় না। পূজার সময় হ'লেই মা আসবেন—আমার কথা মিথ্যা হবে না।"

পুনঃ পুনঃ একই উত্তর শুনিয়া অনুশীলার সকল ধৈর্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। 'আজি দেড় বৎসর সে শ্বশ্রুর সেবা করিতে পায় নাই। দারুণ অভিমানে চলিয়া গিয়াছেন তিনি—তথাপি তাহারা গিয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা চাহিলে কি তিনি ফিরে না এসে পারতেন!"

শত অনুরোধেও অনুশীলা স্বামীকে প্রবুদ্ধ করিতে পারে নাই। গভীর অনুশোচনায়, দারুণ মনোবেদনায় তাই পল্লীবধূর নয়নপদ্ম অশ্রুস্রোতে ভরিয়া ওঠে—বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসে পল্লীলক্ষ্মীর বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া যায়!

ঠাকুরবাটীর ফুল বাগানের নিরালায় বসিয়া স্বামী-সোহাগিনী

আজি আবার নূতন করিয়া তাহার পুরাতন অনুরোধ পতিপদে নিবেদন করিবার উদ্যোগ করিল। এমন সময় অনন্তদেবের সঙ্গে নবগোপাল সেইখানে উপস্থিত হইলেন। অনুশীলা ঘোমটা টানিয়া অমনি অন্দর-অভিমুখে চলিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু বাধা দিয়া অনন্তদেব জোড়করে নিবেদন করিলেন,—

"লজ্জা কি মা? অধম ত তোমাদেরই সাত পুরুষের নফর! সন্তানের কাছে সঙ্কোচ করো না মা। আমরা যা বলতে এসেছি, শুনে—একটা সৎযুক্তি ঠিক করে দাও মা।"

সেই প্রদেশের সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, জগদিন্দু নিতান্ত স্ত্রৈণ। স্ত্রীর পরামর্শেই তিনি স্বেচ্ছায় জমিদারীর ঝঞ্ঝাট ত্যাগ করিয়া, সুখের সন্ধানে ঠাকুরবাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছেন।

অধুনা তাঁহার সাধনা-বৈরাজ্যের বিপুল সাফল্য দেখিয়া অপর সকলেরই সেই ভুল ধারণা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু অনন্তশর্ম্মা পৃথিবীর বহির্ভূত জীব, তিনি এখনও সেই ধারণা লইয়াই বসিয়া আছেন—তাই বুঝি তিনি অনুশীলার সহায়তা ভিক্ষা করিলেন।

গভীর বিষয়বুদ্ধির পরিচায়ক ভ্রুভঙ্গীসহ অনন্তদেব—স্নিগ্ধ, আর্দ্র, সবুজ দূর্ব্বাদলোপরে বসিয়া পড়িলেন; নবগোপালও তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিল। অতঃপর উভয়েই একটা জমকাল গোছের নাটকীয় ঘটনা সংঘটনের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

ধুরন্ধর যুগলের আকস্মিক আগমন এবং অনন্ত শর্ম্মার আড়ম্বরপূর্ণ ভণিতাবাক্যে বিস্মিত হইয়া সরলভাবেই জগদিন্দু বলিলেন,—

"আজ হঠাৎ কুটুম্বের সঙ্গে আপনাকে দেখে আমার প্রাণ কেঁপে

উঠেছে। আবার কোন চক্রান্ত ক'রে ঠাকুরবাড়ীটি পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করবার অভিরুচি করেছেন কি?"

"মহাভারত।" বলিয়া অনন্তদেব জিভ কাটিলেন। তথাপি জগদিন্দু বলিয়া গেলেন,—

"মন্দ কি? সংসারের শেষ বাঁধনটাও কেটে যায়! যাক্, যা বলতে এসেছেন অল্প কথায় একটু তাড়াতাড়ি বল্লে বড়ই সুখী হব।"

যুগল নর-শৃগালের সংসর্গ জগদিন্দুরও অসহ্য জ্ঞান হইতেছিল। তাঁহার মুখাবয়বে দারুণ ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিল। বুঝিতে পারিয়াই নিজের উপর তাঁহার ধিক্কারের ভাব জন্মিল।

বিকশিত দন্তপাটি হাস্যের লাস্যে উদ্ভাসিত করিয়া নববাবু গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন,—

"সে কি বেয়াই! অন্যায় অনুমতি করো না। আজ আমরা সত্যই তোমার উপকার কর্ত্তে এসেছি।"

এবার জগদিন্দু সত্যই ভীত হইলেন। জীব বিশেষের উপকার যে কার্য্যতঃ সকল ক্ষেত্রেই মহা অপকারে পর্য্যবসিত হয়, তাহা তিনি জানিতেন। তাই ভয়ে ভয়ে তিনি বলিলেন,—

"খুব বাধিত হলেম। কিন্তু সত্যই নববাবু, সম্প্রতি আমাদের কাহারও কোন উপকারের প্রয়োজন নাই। বৈরাগী আমরা—কৌপীনমাত্র অবলম্বন করেই দিব্যি সুখে আছি।"

সুযোগ পাইয়া অনন্তদেব বলিলেন,—

"এ কথা ব'লে আর কেন লজ্জা দেন ছোটবাবু? না বুঝে,

দুষ্টের কথায় কত বড় একটা মহাপাপ করেছি, তাই বুঝতে পেরে আজ প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি আমরা।”

জগদিন্দুর প্রশান্ত মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। অতি সরলভাবে তিনি বলিলেন,—

“আপনারা যা করেছেন, দেখতে সেই কাজটা খুব নোংরা হ’লেও, আপনি জানেন না যে, তার ফলে কি একটা বিরাট উপকার হ’য়েছে আমার।”

বিপরীত অর্থ বুঝিয়া আবার শুষ্ক হাসির সঙ্গে অনন্ত বলিল,—“যাই বলেন, আমরা এবার সবই বুঝেছি। তাই আমরা ছুটে এসেছি আজ—আবার আপনার জমিদারী আপনার হাতেই ফিরিয়ে দিতে।”

নবগোপাল এবং অনন্ত উভয়েরই ধারণা ছিল যে এমন একটা কথা শুনিয়াই জগদিন্দু আনন্দে অষ্টধা বিভক্ত হইয়া যাইবেন। কিন্তু তেমন কিছুই হইল না। পক্ষান্তরে কথাটায় জগদিন্দুর প্রাণে যুগপৎ ভয় ও ঘৃণা জাগাইয়া তুলিল। তিনি ধীরে স্থিরকণ্ঠে বলিলেন,—

“আমি ত তা চাইনি? অযাচিতে এতটা অনুগ্রহ পরিপাক করাও আমার পক্ষে শক্ত হ’য়ে পড়বে। আর, আপনাদের নিগ্রহে ভয় করিনা বটে, কিন্তু আপনাদের অযাচিত অনুগ্রহে সত্যই আমার বড় ভয় হয়।” জগদিন্দুর অনুকম্পা-মিশ্রিত কটাক্ষে নবগোপাল ও অনন্তের আঁখিপদ্ম মাটির সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে চাহিল।

অনন্ত মনে করিল যে, তাহারা যে আজ কত বড় একটা পাশুপত অস্ত্র জগদিন্দুর হাতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন, তাহা

তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। দুর্ব্বল মনকে ইরূপে প্রবুদ্ধ করিয়া তিনি আবার কহিলেন,—

"অন্যায় অনুমতি করবেন না ছোটবাবু। দোষ স্বীকার কোরে মার্জ্জনা চাইতেই ত' আমরা এসেছি।"

"তা হ'লে আর কষ্ট ক'রে আসবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেন না—আমি বহুপূর্ব্বেই সকলকে মাপ কোরেছি।" উদার হৃদয়ের সমস্ত পবিত্রতার সঙ্গে জগদিন্দু তাহাদের চক্ষের উপর চাহিলেন।

আনন্দে আটখানা হইয়া অনন্তদেব কহিলেন,—"এমন না হ'লে দেশটা শুদ্ধ মাতিয়ে—অর্থাৎ কিনা ছাই—"

প্রাণের মলিনতা চাপিয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টায়, আজি ব্যর্থ-মনোরথ কূটচক্রীর মুখে তার স্বভাবসিদ্ধ সহজ, সরল খোশামোদের ভাষাও ভিন্নরূপে বাহির হইয়া পড়িল।

হাসিতে হাসিতে জগদিন্দু বলিলেন,—"বুঝেছি দাওয়ানজী! মনের ভাব—ভাষার চেয়ে মুখের ভঙ্গীতেই বেশী বুঝা যায়।"

সুমধুর আপ্যায়নবাক্যে পুরুষরত্ন-দ্বয়কে বহির্বাটীতে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, জগদিন্দু অনুশীলার সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিলেন।

অনন্ত ছোটবাবুর দুঃখে গলিয়া গেলেন। 'হায়, হায়, এমন বোকা না হ'লে কি রাজত্বি খুঁইয়ে—চাষা ভূষার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে যায়!'

যাহা হউক, অনন্ত আজি প্রতিহিংসার প্রবল অনলে জ্বলিয়া—

জগদিন্দুর হাতে সত্যই শ্যাটোর "জীবন মরণের কাটি" তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। তিনি নিশ্চয় জানেন, জগদিন্দু যত বড় মূর্খই হউক না কেন—যখন সেকথা সে বুঝিতে পারিবে, তখন তাহাদেরে 'কোলে' তুলিয়া নিতে পথ পাইবে না।

তাই, কষ্টে সকল সৎসাহস একত্রিত করিয়া লইয়া, লাল কাপড়-মোড়া এক তাড়া মূল্যবান দলিলপত্র সে জগদিন্দুর পায়ের তলায় ধরিয়া দিয়া বলিল,—

"এই নিন্ ছোটবাবু! লাখ টাকায় যা কেউ কিনে দিতে পারত না, তাই আজ আপনাকে দিয়ে গেলেম।" একগাল হাসির প্রদীপ্ত আলোকে অনন্তের আকর্ণবিশ্রান্ত অধরগহ্বর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

জগদিন্দু কিন্তু এই মহামূল্য উপঢৌকনের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। তাই তিনি সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অতিশয় হর্ষভরে আবার একগাল হাসির সঙ্গে অনন্তদেব বলিলেন,—

"খুলে দেখুন ছোটবাবু! সত্য দলিলগুলি সব এতেই বাঁধা রয়েছে; এগুলি পালটে জাল দলিল দাখিল কোরেই ত'—"

আর বলিবার আবশ্যক হইল না। এবার জগদিন্দুর কাছে সকল কথাই পরিস্ফুট হইয়া গেল। ক্ষোভে, লজ্জায়, বিস্ময়ে তিনি অধীর হইয়া ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। পরে স্বভাবসিদ্ধ মধুরতার সঙ্গে ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"ভুল করেছ অনন্ত! স্বর্গের সুখে ঠাকুরবাড়ীতে রয়েছি; আর কি আমরা জমিদারীর নরকে নেমে যেতে পারি?"

অনন্ত বুঝিলনা যে কতবড় আত্মত্যাগী মহাপুরুষের সম্মুখে সে

অমৃত বলিয়া বিষ ধরিয়া দিতে আসিয়াছে। তাই সে ভাবিল, 'বুঝি মূর্খটা এখনও বুঝতে পারে নাই যে কি সকল মহাস্ত্র তার হাতে তুলে দিয়েছি।'

মনের ভাব গোপন রাখিয়া কঠোর স্বরেই সে বলিয়া ফেলিল,—

"সে কি ছোটবাবু! এত ছেলে মানুষ ত নন্ আপনি যে, এই কাগজগুলির মূল্য জানেন না। রসিক উকিলের হাতে নিয়ে এই কাগজগুলি দিলে, আপনার বিষয় ত আপনার হাতে আসবেই—সুধু একটা দরখাস্তের ওয়াস্তা! তারপর শ্রীযুতের ন্যূনপক্ষে চৌদ্দটি বছর শ্রীঘরবাস রোখে কে?"

দারুণ উৎকণ্ঠায় অনন্ত, জগদিন্দুর পানে চাহিয়া রহিলেন।

আবার হাসিতে হাসিতে জগদিন্দু বলিলেন,—"আমি বিষয় চাইনা, অনন্ত। জানি, তুমি আজ কি মহা অস্ত্র, ভোলাদা'র,আততায়ী ভেবে আমার হাতে তুলে দিচ্ছ—তাঁর সর্ব্বস্ব কেড়ে নিতে পারি তা দিয়ে। কিন্তু তুমি জান না, তিনি আমার ভাই—ভাই কি কখনো শত্রু হ'তে পারে? তিনি যে আমার ভাই, আমার মান অপমান, শুভাশুভের দোসর!

"বেইমান তোমরা, তাই, ভাইয়ের হাতে ভাইকে হত্যা করবার বিষ-মাখান ছুরি ধুরে দিচ্ছ। ছি, ছি! অনন্ত, নববাবু, তোমরা কাশী যাও—গঙ্গার জলে প্রাণের ময়লা ধু'য়ে এসো গে!

"মিথ্যা মামলার লোভ দেখাতে এসেছ আমায়? ছি, ছি! অনন্ত, তোমরা কি?

"অধম প্রাণহীন জড় পদার্থের চেয়েও নির্জীব আমরা! পিঞ্জর-বদ্ধ

পাখীর চেয়েও অসহায় আমরা! মনে করোনা অনন্ত, খাঁচা সোণা দিয়ে তৈরী হ'লে—বা চাল জলের বদলে ছোলা আর গোলাপ জলের ব্যবস্থা করলেই—পিঞ্জরবন্দী পাখীর বন্ধনজ্বালা ঘুচে যায়। না—অনন্ত! এক মহা বিশাল কারাগারে সবাই বন্দী আমরা। কারু ভাগ্যে খেতাব সার্টিফিকেটরূপ মখমলের আবরণ, কারো জমিদারীরূপ ছোলা দানার বরাদ্দ—কারু চাকুরীরূপ স্বর্ণপিঞ্জর!

"কিন্তু সবাই সমান ভাবে এক কারাগারে বন্দী আমরা! যার বন্দী, তিনি যেই মন্ত্র পড়াবেন—তাই পড়তে হবে! নৈলে পক্ষীর জীবন, চাকর বাকরের সঙ্গীনের খোঁচায় এক মুহূর্ত্তে অনন্তের সঙ্গে মিশে যায়!

"এই বন্দীর জীবনে কি প্রলোভন আমার হাতে ধরে দিতে চাও অনন্ত? প্রলোভনের সামগ্রী কি আছে আমাদের?"

বলিতে বলিতে দর দর করিয়া অশ্রুমালা জগদিন্দুর গণ্ড বহিয়া বুক ভিজাইয়া দিল।

এই সুদীর্ঘ ভাবময় বক্তৃতার বাণ অনন্তের প্রাণের একটি নিভৃত কোণেও আঁচর কাটিতে পারিল না। তাহার ধারণায় আসিল না যে, 'এমন ব্রহ্মাস্ত্রগুলি হাতে পাইয়াও কেমন করিয়া জগদিন্দু হেলায় উপেক্ষা করিতে পারে।' অত্যন্ত অনুকম্পার স্বরে সে বলিল,—

"সে কি ছোট বাবু! দেখুন একবার, কতগুলি 'মারণ বাণ' আপনার জন্য সংগ্রহ করে এনেছি।"

বলিতে বলিতে অনন্তদেব সপ্ত-বস্ত্রখণ্ড-মণ্ডিত মহামূল্য রত্নরাজি উন্মুক্ত করিয়া জগদিন্দুর অন্ধ নয়নের কাছে ধরিয়া দিল। কিন্তু সুমধুর হাস্যে স্বর্গীয় পবিত্রতা সৃষ্টি করিয়া জগদিন্দু তাহাকে বলিল,—

"আমি দেখতে চাই না। বলেছিত আমার মোহ কেটে গেছে।"

"আজ্ঞে মামলা মোকদ্দমা কিছুই কর্ত্তে হবে না। এই কাগজ-গুলি আপনার হাতে পড়েছে জান্‌তে পারলেই আপনার বিষয় ফিরিয়ে দিয়ে—পায়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাতে পথ পাবে না।" বলিয়া অনন্তদেব জগদিন্দুকে দৃষ্টিশক্তি প্রদানের শেষ চেষ্টা করিল।

"বলেছিত, আমি বিষয় চাই না! কি করবো দেওয়ানজী, বিষয়-মদে নেশা হয় না ব'লে—বড় নেশার চুর হ'য়ে আছি আমি!" বলিয়া আবার জগদিন্দু সমুচ্চ হাসির সঙ্গীতে আকাশ বাতাস ভরিয়া দিল।

এতক্ষণে নবগোপাল এবং অনন্তদেব উভয়েরই নিজ নিজ আশু বিপদের কথা মনে পড়িল।

"তা হ'লে আমাদের কি হবে?" বলিয়া উভয়ে ছোট বাবুর করুণাভিক্ষা করিল।

"কিছুই হবে না। ছোট হিস্তায় বা পুলিশে কোথাও ধরিয়ে দেব না তোমাদের। ঐ অবস্থায় ওখানেই কাগজগুলি রেখে যাও, বড়বাবুকে ফিরিয়ে দেব'খন।"

বলিয়া জগদিন্দু আবার সুমধুর হাসির বৃষ্টিতে বাগান প্লাবিত করিয়া দিলেন।

'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' এই মহান বাক্যের অনুসরণ করিয়া নবগোপাল এবার নিজের হাতে হাল গ্রহণ করিয়া বলিল,—"সুস্থ হ'য়ে ভেবে-চিন্তে কি জানেন ছোট বাবু—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া জগদিন্দু বলিলেন "শোন মূর্খ—তুমিও শোন বৃদ্ধ! ব্যাভিচারে সমস্ত জীবনটা কাটিয়েছ—ভাবনার অবসর

পাওনি তোমরা, তাই অমৃত বলে আমার মুখে বিষ তুলে দিতে চাও। সংক্ষেপ দেড় বৎসরের অবসর-কলে আজি এই প্রদেশের শুষ্ক মাটিতে সোণা ফলেছে ভাখ। প্লাবন-মারী-মথিত কঙ্কালের মুখে অমৃত ঢেলে, তাকে আবার সজীব ক'রে তুলেছি ভাখ। অতুল ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে যা কেনা যায় না—ত্যাগের মূল্যে বড় সুলভ তা।"

এইরূপে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া প্রস্থানকালে অনন্তদেব ভাকিল,—"চিরকেলে আহাম্মক তাই জগদিন্দুর ভাল মন্দ জ্ঞান নাই।" আর নবগোপাল? দারুণ হতাশার ব্যথায় মুখ ফুটিয়া সে বলিয়া গেল যে—

"হাতে পাইয়াও যখন জগদিন্দু মহারত্নের আদর করিল না—কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদের পরিবর্ত্তে যখন সে তাহাদের তিরস্কার করিয়া বিদায় করিল—তখন তাহার কিছুতেই ভাল হইবে না।"

যুগলমূর্ত্তি বিদায় হইয়া গেলে আরামের দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া অনুশীলা বলিল—"লোক দু'টা ভাবলে, আমরা বড় বোকা।"

তাহার কথায় সায় দিয়া জগদিন্দু বলিলেন, "ভাববে না? এই হচ্ছে দুনিয়া! চোর জুচ্চোর যারা, তারা ভাবে গৃহস্থেরা বড় বোকা! মাতাল যারা, তারা ভাবে মানুষগুলি বড় বোকা—তাই এমন সুধা খেয়ে দেখলে না। ভোগী ভাবে, যোগীগুলি অতিশয় বোকা—দুনিয়াটা তাই ভোগ করলে না।"

এমন সময় ধীরে ধীরে শান্তিময়ী পারুলের সহিত পূজার ডালি লইয়া ঠাকুর বাড়ী যাইবার পথে, জগদিন্দু এবং অনুশীলার সাক্ষাত পাইয়া দাঁড়াইলেন।

উভয়ের মন তখন বিষম ভারাক্রান্ত। সেই দিন অবধি অনেক চেষ্টা করিয়াও আর তাঁহারা শ্যাটোকে তাঁহাদের মনের কথা বুঝাইয়া বলিবার অবকাশ পায় নাই। শ্যাটোর কল্যাণার্থ তাই তাঁহারা ঠাকুবাড়ী পূজা দিতে আসিয়াছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শান্তিময়ী জগদিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওদের দুজনকে এদিক দিয়ে যেতে দেখলেম না ?"

অনুশীলা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিল। সকল কথা শুনিয়া শান্তিময়ী এবং পারুলের প্রাণ অব্যক্ত কৃতজ্ঞতার বন্যায় ভরিয়া গেল।

"এত উদার, এত মহৎ তুমি ঠাকুরপো—" বলিতে বলিতে জগদিন্দুর হাত দুখানি পারুল চ'খে জলে ভিজাইয়া দিল।

সকল দ্বিধা, সকল বিভ্রান্তির শেষ মোহ তাঁহাদের প্রাণ হইতে সেই মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইয়া গিয়া, মনে মনে উভয়কে দেশাত্মবোধের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ফেলিল।

জগদিন্দুর অনুরোধে শ্যাটোর 'মারণ অস্ত্রগুলি' গ্রহণ করিয়া, ভক্তিভরে বিগ্রহপূজা শেষ করিয়া, বধূসহ শান্তিময়ী শ্যাটোর উদ্দেশে ছুটিল। তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, কথাটা যখন শ্যাটোর কর্ণগোচর হইবে—যত বড় পাষণ্ড হউক না কেন সে, এই অপূর্ব্ব ত্যাগ তিতিক্ষার তেজে গলিয়া নিশ্চয় সে ছুটিয়া আসিবে—ভাইয়ের সহিত ভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইবে। এত বড় একটা স্বার্থত্যাগের আকর্ষণ ব্যর্থ হইতেই পারে না!

এতদিন শ্যাটো বদ্ধ দুয়ার কক্ষে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই দিন

প্রত্যূষেই সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাই শূন্য কক্ষের মুক্ত দুয়ারে দাঁড়াইয়া শান্তিময়ী ব্যর্থতার ব্যথায় কাতর হইয়া পড়িলেন।

নিদারুণ অনুশোচনা এবং অজ্ঞাত অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পতিসোহাগ-সর্ব্বস্বা সাধ্বী, চেতনা হারাইয়া ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল।

---

(১৫)

শান্তিময়ী দীর্ঘকাল কর্ত্তার উইলের কথা গোপন রাখিয়া শ্যাটোকে জমিদারীর সর্ব্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন—উচ্চতম এক মহান উদ্দেশ্যের প্রেরণায়।

তিনি অপুত্রক। দত্তক গ্রহণের অধিকার উইল অনুসারে তাঁহার ছিল; কিন্তু পরের পুত্রের মাতৃত্ব অপেক্ষা ভগিনীপুত্রের মাতৃত্বই তিনি শ্লাঘনীয় জ্ঞান করিলেন। বিশেষতঃ, শ্যাটোকে তিনি শৈশবাবধি পুত্রস্নেহে লালনপালন করিয়া, তাঁহার উপর সত্যই পবিত্র মাতৃত্বের উচ্চতম দাবী সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

তাঁহার দান অপেক্ষা কর্ত্তার উত্তরাধিকার-সূত্রে বিষয়প্রাপ্তি শ্যাটোর অধিকতর গর্ব্বের বিষয় হইবে, ইহাই শান্তিময়ীর বদ্ধমূল ধারণা ছিল। নির্ভেজাল পরার্থপরতার প্রেরণায় তাই শান্তিময়ী এতদিন শ্যাটোকে উইলঘটিত কোনও কথা জানিতে দেন নাই।

কিন্তু শ্যাটোর স্বেচ্ছাচারিতা যখন শান্তিময়ীর ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিল, তখন পিতার বিষয়, সম্মান, প্রতিষ্ঠা বজায়

রাখিবার জন্য তাহাকে বাধা প্রদান করিতে হইল। শান্তিময়ীর ধারণা ছিল সহজেই তিনি হীন স্বার্থান্ধ যুবককে আয়ত্বাধীন করিয়া আবার সংসারে পূর্ব্বের শান্তি ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন।

কিন্তু ভাগ্যদোষে ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। শ্যাটো মনে করিল, শান্তিময়ী কর্ত্তার উইল গোপন রাখিয়া তাহাকে প্রতারিত করিয়াছেন। কেন না—বিষয়ের কপর্দ্দকমাত্রের ন্যায্যাধিকারী না হইয়াও—শান্তিময়ীর ছলনায়, নিঃসঙ্কোচে সে এতদিন মিথ্যা জমিদারীর মোহে নিমজ্জিত ছিল।

শান্তিময়ীর সমুচ্চ হৃদয়ের উচ্চতর ত্যাগের মহান পবিত্রতা উপলব্ধি করিবার শক্তি শ্যাটোর ছিল না—অত কথা সে ভাবিতেও পারিল না। সোজা কথায় সে বুঝিল, নিজ আয়ত্বে রাখিয়া যথেচ্ছ কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্যই তিনি কর্ত্তার দ্বারা উইল করাইয়া, সেই উইল এতদিন গোপন রাখিয়াছিলেন।

কাজেই শ্যাটো যখন বুঝিতে পারিল যে, এতদিন সে মিথ্যা জমিদার সাজিয়া একটা অভিনয়মাত্র করিয়া আসিয়াছে, বিষয়ে সত্যই তাহার কোনও অধিকার নাই—তখন তাহার হৃদয়ে এমন একটা প্রবল আঘাত লাগিল যে, সেই আঘাতে তাহার ভবিষ্যতের সকল কল্পনাচিত্র ভাঙ্গিয়া গেল।

শ্যাটো জানিত যে, মাতামহ বর্ত্তমানে মাতৃবিয়োগ ঘটিলে দায়ভাগ অনুসারে দৌহিত্রের সেই বিষয়ে অধিকার নাই। তথাপি যখন শান্তিময়ী স্বেচ্ছায় তাহাকে বিষয়াংশ ছাড়িয়া দিলেন—তখন তাহা অপর সকলের অজ্ঞতা এবং নিজের সৌভাগ্য বলিয়াই সে মনে করিল।

এতটুকু আত্মপ্রবঞ্চনা শ্যাটোর চরিত্রে সম্ভব এবং স্বাভাবিক। কিন্তু যখন সে জানিল যে, উইল সত্বেও জানিয়া শুনিয়া কেবল অনুগ্রহ করিয়া মাসীমা তাহাকে কৃত্রিম জমিদার সাজাইয়া রাখিয়াছেন, এবং নিজের অভিষ্টপথে বাধা পাইয়াই তিনি উইলের বলে তাঁহার অনুগ্রহের দান ফিরাইয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন—তখনই শ্যাটোর সুপ্ত, নিদ্রিত অভিমান জাগিয়া উঠিল!

শ্যাটোর হাতে যথেষ্ট অর্থ থাকিলে সে মাসীমার সহিতও আবার মামলা মকদ্দামা লড়িয়া দেখিত। কিন্তু শ্যাটোর এক কপর্দ্দকও সম্বল তখন অবশিষ্ট ছিল না। উপরন্তু সে কল্পিত জমিদার সাজিয়া অপরের বিষয়ের অর্দ্ধাংশ নিজের বলিয়া দুইবার বন্ধকও দিয়া বসিয়াছে। অর্থ এবং বিষয়ের জন্য প্রতারণাময়ী মাসীমাতার পায়ে লুটাইয়া পড়া ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর নাই—কিন্তু শ্যাটোর সেই প্রবৃত্তি হইল না।

তাহার মনে পড়িল, কেমন করিয়া সে এতদিন মাসীমার সহিত সমান অংশীদাররূপে মাথা উঁচু করিয়া ছিল। আজি সেই উচ্চ শির নত করিবার মত মানসিক বল তাহার জুটিল না। প্রবল পরাক্রমে যেখানে জমিদাররূপে প্রজা শাসন করিয়াছে, সেই খানেই আবার মাসীমার "পোষ্য-পুত্র"-রূপে মুখ দেখাইতে শ্যাটোর মত জীবেরও লজ্জাবোধ হইল। বিশেষতঃ, গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থার কথা মনে পড়িয়া, সেই লজ্জা শ্যাটোর প্রাণে দ্বিগুণতর দৈন্য জাগাইয়া তুলিল।

শান্তিময়ী শত চেষ্টা করিয়াও আর শ্যাটোকে তাঁহার মনের কথা

বুঝাইতে পারিলেন না। উত্তেজিত শ্যাটো হীন তিরস্কারবাক্যে শান্তিময়ীর প্রাণে ব্যথা দিয়া বারবার তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে।

এইভাবে সপ্তাহকাল বদ্ধগৃহে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া, সেইদিন প্রত্যুষে শ্যাটো কোথায় চলিয়া গেল।

শান্তিময়ী এবং পারুল এই আকস্মিক ব্যাপারে প্রথমতঃ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে অসাধারণ মানসিক সংযম-অভ্যাসের ফলে, উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইয়া ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইলেন।

শান্তিময়ী এবং পারুল দুই জনের প্রাণেই দেশাত্মবোধের বান ডাকিয়াছে। সেই পবিত্র ভাব একবার প্রাণে জাগিয়া উঠিলে স্বার্থচিন্তার সকল মোহ দূরে সরিয়া যায়।

তাই শান্তিময়ী কতিপয় হৃদয়বান বিশেষজ্ঞ লোকের সহায়তায়, মনোমত দলিলাদির খসরা প্রস্তুত করাইয়া লইলেন, এবং যথা-সময়ে সেই দলিল আইনানুসারে লিখিয়া সহি করিয়া রেজেষ্ট্রী করিয়া রাখিলেন।

সেই দিন শান্তিময়ী জগদিন্দুর যেই সুমহান ত্যাগশীলতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার প্রতি সেই মহীয়সী রমণীর আন্তরিক শ্রদ্ধা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া, উভয় পরিবারের মধ্যে আবার সম্প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

নিরুদ্দিষ্ট ভোলানাথের খোঁজ করিবার জন্য জগদিন্দু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, চারিদিকে লোকজন পাঠাইয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছেন।

শুদ্ধ ব্রতধারিণী পারুল, সমস্ত দুঃখ দৈন্য শ্রীভগবানের পদে সমর্পণ

করিয়া অনুশীলার সহিত পল্লীলক্ষ্মীগণের হিতকর নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

শান্তিময়ী অপর সকল কথা ভুলিয়া জগদিন্দুর মাতার আসনে বসিয়া—তাঁহার পল্লীসঙ্ঘের যাবতীয় কার্য্যের সাহায্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে আরও কয় মাস কাটিয়া গেল—শ্যাটোর কোনও খোঁজই পাওয়া গেল না।

এই বৎসর জগদিন্দুর আশানুরূপ মিয়াদগঞ্জে একটি ব্যাঙ্ক, একটি পাটকল এবং একটি কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে।

প্রত্যেক গৃহস্থ-গৃহের আশে পাশে—প্রত্যেক পল্লীতে যেই সমস্ত উচ্চভূমি নিরর্থক পতিত পড়িয়াছিল, সঙ্ঘের নিয়মানুযায়ী তাহাতে সঙ্ঘের খরচে ফুটি তূলার গাছ রোপণ করা হইয়াছে।

এই ভাবে—মিয়াদগঞ্জ পরগণার একোবিংশতিসংখ্যক পল্লী হইতে শতাধিক মণ তূলা উৎপন্ন হইয়া, তদ্দারাই ছোট রকমের একটি কাপড়ের কলের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

পল্লীসঙ্ঘের চেষ্টায় এইরূপে এই আদর্শ পল্লীসংহতি আজি এক অপূর্ব্ব শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সমৃদ্ধির দিব্যরূপে উদ্ভাসিত হইয়া, পল্লীবাসী আবালবৃদ্ধ সকলের প্রাণে এক পবিত্র ভবিষ্যত-আলেখ্যের ছায়াপাত করিয়াছে।

---

(১৬)

আষাঢ় মাসের প্রারম্ভে মিয়াদগঞ্জের নদী নালা পুকুর বিল নূতন জল প্লাবনে ভরিয়া গিয়াছে। শ্যামল তৃণদল ছাপাইয়া ঝিকিমিকি বর্ষার জলে পল্লীলক্ষ্মী, এক দিব্যরূপে পল্লীবাসীর প্রাণ উৎফুল্ল করিয়া তুলিল।

গোধূলীর রক্তাম্বর সম্মুখে—সদ্যস্নাতা, গৃহমুখী পল্লীবধূর নবনীত অঙ্গের কাঁচা হলুদ মাখান উচ্ছ্বসিত রূপতরঙ্গ, দেহবিজড়িত আর্দ্র বসন ভেদ করিয়া—ধরাগাত্রে দিব্য সুষমা বিকীর্ণ করিতেছে।

মাঠে মাঠে পাটের ক্ষেতে বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার প্রতিদিন সগর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া বিদেশীয়ের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

হৈমন্তিক ধান্যের তরুণ, শ্যামল তরঙ্গ, বাতাসের সঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া বিশ্বের শস্যভাণ্ডার—বাঙ্গলার গৃহস্থপ্রাণে নব পুলক জাগাইয়া তুলিয়াছে।

আবার, আশু ধান্যের সদ্যসঞ্জাত মুকুলিত ফলগুচ্ছের তলে বায়ু হিল্লোলিত—গলিত স্ফটিক তরঙ্গের সঙ্গে, গৃহস্থের মুখে সাফল্যের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে।

কল-কল-মধুর জলস্রোত-প্রতিকূলে দলে দলে কতবিধ কই মাগুর পুঁটি মাছের পাল উল্লাসে উজাইয়া আসিয়া পল্লীবালকের যন্ত্রব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

আহা! সোণার বাঙ্গালার মাঠে মাঠে ধান—গোঠে গোঠে

মা কপিলার অফুরন্ত দুগ্ধ-ভাণ্ডার—পুকুরভরা মাছ—সেই বাঙ্গলার গৃহস্থ আজি পরমুখাপেক্ষী! কোন্ বিধাতার এই তীব্র অভিসম্পাত!

রবিশস্য গোলাজাত করিয়া, দারুণ গ্রীষ্মের তপ্ত রবিকর মাথায় করিয়া বাঙ্গালার কৃষক, মাঠে মাঠে সোণার তরঙ্গ ঢালিয়া দিয়া আজি সঙ্ক্ষেপ বিশ্রামানন্দে মগ্ন হইয়াছে।

এই মাহেন্দ্র সংযোগে শান্তিময়ী, গ্রাম্য প্রধানগণের সহিত একমত হইয়া মিয়াদগঞ্জের আদর্শ পল্লীসঙ্ঘের দ্বিবার্ষিক মহোৎসবের আয়োজনে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।

এই বৎসরের মহোৎসবের একটা বিশেষত্ব এই যে, জগদিন্দুর মহান অনুষ্ঠানের প্রতিপক্ষ আজ আর কেহই নাই।

ঠাকুরবাড়ীর বৃহৎ নাটমন্দির পত্র পুষ্পে ভূষিত হইয়াছে। অহর্নিশি সেখানে মাতৃকীর্ত্তন চলিয়াছে। তিন দিন ইতর-ভদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দুমুসলমান—অসংখ্য জনসঙ্ঘ জাতিভেদ, ধর্ম্মবৈষম্য ভুলিয়া, মহোৎসবের আনন্দে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

দেশ দেশান্তর হইতে দরিদ্র নারায়ণগণ মিয়াদগঞ্জের আপামর সাধারণ-সহ একত্রে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসিয়া, পেট ভরিয়া খাইয়া পল্লীবাসীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছে।

আজি রথদ্বিতীয়ার দিনে পল্লীসঙ্ঘের সমস্ত সভ্যের এক মহতী সভার অধিবেশন বসিয়াছে। সভানেতৃ স্বয়ং শান্তিময়ী দেবী।

মিলিত পল্লীবাসীর সঘন উল্লাসধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছে।

যথারীতি গত বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাঠ ও গ্রহণান্তর অন্যান্য আবশ্যকীয় সমস্ত প্রসঙ্গের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। দিব্য পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়া ভজহরি তখন বামে দক্ষিণে শ্যামল ও দয়িতাকে লইয়া নাট-মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে বিরাট আনন্দে গাহিয়া উঠিল,—

আমার মাকে কাঙ্গাল বলে কে ?
গোটা বিশ্বের জঠরজ্বালা—একলা জুড়ায় সে !

সভার নিয়মিত :কার্য্য শেষ করিয়া শান্তিময়ীদেবী সমবেত জনসমুদ্রের মধ্যে দাঁড়াইলেন। অল্প কথায় নিজের বক্তব্য সকলকে বুঝাইয়া দিয়া তিনি স্তম্ভিত, বিস্ময়-পুলকিত সভ্যমণ্ডলীর নিকট প্রচার করিলেন যে, পিতার উইল অনুসারে তিনি ছোট তরপের সমস্ত জমিদারীর একমাত্র স্বত্বাধিকারিণী।

সেই উইল এবং প্রবেটের সহিত তিনি নিজকৃত দলিল দুইখানা সভার সমক্ষে স্থাপন করিলেন।

সকলে দেখিল, একখানা দলিলে তিনি বড় তরপের সমস্ত বিষয়ের ত্যাগপত্র লিখিয়া জগদিন্দুকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। অপর দলিলে তাঁহার পিতার পরিত্যক্ত সমস্ত জমিদারী শান্তিময়ী, পল্লীসঙ্ঘের নামে লিখিয়া দিয়াছেন। তাহা হইতে কেবল যৎসামান্য মাসোহারা তাঁহার দৌহিত্রোপম শ্যামল এবং তাহার ভাবী গৃহলক্ষ্মী দয়িতা পাইবে।

উপরন্তু পঞ্চলক্ষ পরিমিত সঞ্চিত অর্থ শান্তিময়ী শ্রীমান জগদিন্দু মুখোপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; তদ্বারা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী এক বা ততোধিক পল্লীহিতকর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইবে।

নিজের এবং বধূ পারুলের ভরণপোষণের জন্য তিনি আবশ্যক মত অর্থ পল্লী-সঙ্ঘের ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছেন।

বলিতে বলিতে বিগলিত-অশ্রুনয়না মহীয়সী ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে শ্যামল এবং দয়িতাকে কাছে ডাকিয়া সেই পুণ্যদিনে তাহাদের কচি হাত দুই জোড়া এক করিয়া দিলেন। সমবেত জনতরঙ্গ মথিত করিয়া ঘন ঘন জয়োধ্বনীতে সমস্ত পল্লী মুখরিত হইল।

এমন সময় শাস্ত্রী মহাশয়, সত্যভামা দেবী এবং এক তরুণ সন্ন্যাসী-শিষ্যসহ সেখানে উপস্থিত হইয়া শিশুদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে জননী সত্যভামা পুত্র ও পুত্র বধূকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া তাহাদের শিরে সহস্র চুম্বন করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব মাতৃত্বের গর্ব্বে তাহার প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে—কণ্ঠের ভাষা গলিয়া গিয়া নয়নপথে আনন্দের ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে।

অনুশীলা দেখিল সত্যই তাহার সত্যসন্ধ পতিবাক্য বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গেল। মাতৃপূজার দিব্য আরতি-মুহূর্ত্তে মাতা সত্যই আসিয়া মাতৃপীঠ উজ্জ্বল করিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

তরুণ সন্ন্যাসীর প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। হঠাৎ নারী-সভ্যগণের মধ্য হইতে ছুটিয়া আসিয়া পারুল পাগলের মত সেই সন্ন্যাসীর পদযুগল বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকলে দেখিল তরুণ সন্ন্যাসী আর কেহ নয়—ম্লেচ্ছাচার-নিমজ্জিত ভোলানাথই আজ পবিত্র সন্ন্যাসগ্রহণে সৌম্য মূর্ত্তি লইয়া মিয়াদগঞ্জের পল্লীসঙ্ঘের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা পার্থনা করিতেছে।

পদধূলী মাথায় তুলিয়া লইয়া জগদিন্দু ভোলাদা'র আলিঙ্গন বদ্ধ হইল—দিব্য আনন্দে উন্মত্তবৎ শাস্ত্রী মহাশয় উচ্ছ্বসিত আবেগে, সমুচ্চ স্বরে অনর্গল বেদগীতি আবৃত্তি করিয়া যুগলশিষ্য—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী-দ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

একা ভজহরি সহস্র কিন্নর কণ্ঠ লইয়া গাহিল—

"বন্দে মাতরম্—
সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং—
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্—"

"লেখকের লিখিবার ক্ষমতা আছে এবং তিনি বলিবার একটি ভঙ্গীও নিজস্ব করিয়াছেন।" —বসুমতী—

"উপন্যাস-অখ্যানটি কবির একটি নূতন কল্পনা। * * * বেশ জমকালো রকমের একটি রোমান্স সৃষ্টি করিয়াছেন।"

—নবসঙ্ঘ—

গ্রন্থকার সমস্যাটির যে স্বাভাবিক উপসংহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। কোথাও এতটুকু আড়ষ্ট ভাব নাই, বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে ভাব নির্ঝরিণীটি কুলকুল করিয়া বহিয়া গিয়াছে। আগাগোড়া কৌতুহল উদ্দীপ্ত থাকে।" —বাসন্তী—

"পাঠকগণ যে এই পুস্তকপাঠে আনন্দ লাভ ক'রবেন একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।" —প্রভাতী—

মূল্য ১৶০ আনা মাত্র।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

জাতীয় আদর্শে লিখিত

ছেলেমেয়েদের ক'—খ'র বই।

হাতেখড়ি

আনন্দবাজার।

এখানি একখানা ছেলেদের বর্ণপরিচয় পুস্তক। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ইংরাজ শাসনের সুফল এবং ইংলণ্ডে থাকিয়াও রাজা আমাদের জন্য কত চিন্তা ভাবনা করেন এই সমস্তের পরিবর্ত্তে "স্বরাজ নয়কো গাছের ফলটী পেড়ে দিব হাতে" এবং "ভবের মাঝে আমরা কেবল অপরের অধীন, তাই জগতের কাছে মোরা এত হেয় দীন" ইত্যাদি ছড়া আছে। এই বইখানির আগাগোড়া ছবি ও ছড়ার সাহায্যে ছেলেদের প্রাণে স্বদেশপ্রেম জাগাইবার চেষ্টা বর্ত্তমান। আমাদের অধীনতাপাশের মূল কারণের প্রতি যতীন্দ্রবাবুর দৃষ্টি পড়িয়াছে, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। বইখানির ছাপা কাগজও সুন্দর।

বাঙ্গলার কথা।

একখানি নূতন ধরণের বর্ণপরিচয় দেখা দিয়াছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "হাতে খড়ি" গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত ছেলেদের দেশের কথা মুখস্থ করাইবার জন্য লিখিত। ভারতের গজমতি কোথায় গেল, কেন সব ছাড়িয়া এখন এতটুকু গোলামী

পাইলেই ভারতবাসী সন্তুষ্ট—এসব কথা ছড়া ও কবিতার মধ্য দিয়া সহজ কথায় লেখক মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন। বাঙ্গলার শিশুরা যে সব বর্ণপরিচয়ের মরফতে হাতেখড়ি শিক্ষা করে, তাহাতে আমাদের সুবোধ বালক করিয়া রাজপুরুষদের সেলাম ঠুকিতেই শিক্ষা দেয়। এখন যদি "হাতে খড়ির" মত পুস্তকের সাহায্যে শিশুরা হাতেখড়ি হইতে দেশের সম্বন্ধে পাঠ মুখস্থ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে আর কিছু না হউক রাজভক্তির পরিচায়ক কতকগুলি মামুলি বুলি শিক্ষার হস্ত হইতে তাহারা রক্ষা পায়।

স্বরাজ।

সুন্দর সুন্দর চিত্রে ইহা সুশোভিত। বালকবালিকার চিত্ত আকৃষ্ট করিতে লেখক যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন ও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন।

বসুমতী।

আমরা শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "হাতেখড়ি" পাইয়া প্রীত হইয়াছি। ছেলেদের এই বর্ণপরিচয় পুস্তকখানিতে ছেলেদের মনে স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া দিবার চেষ্টা আছে। ছড়াগুলি সুমধুর—ছবি ভাল।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

In the midst of numerous money-making publications of the sort, with the supposed object of fostering so-called loyalty but in fact imprinting on the young mind deep-rooted notion of absolute helplessness and perpetual serfdom, Jotin Babu's laudable attemp to effect a sharp retreat of the younger generation from the speedy path of

downright degenaration, is certanly a unique enterprise. In point of get up, illnstrations, physical, moral and intellectual lessons, Hatekhari is exactly what it should be—the want of which we had personally felt for a long time. We can sefely say that every Bengali home should possess Hatekhari to impart lessons to its tender ones for the purpose of bringing up a generation that is destined—according to the another—to usher in true Swaraj.

বাসন্তী।

এঁই অভাগা দেশের অধীন জাতের শিশুগুলির বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থকার দেশ ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত করিতে চাহিয়াছেন। তখন হইতেই যাহাতে তাহারা আপনার অবস্থা ও দেশের অবস্থা জানিতে পায়—গ্রন্থকার সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলেও সাধারণ বর্ণপরিচয় পুস্তকগুলির অপেক্ষা এখানি কোন অংশেই হীন নহে। ছাপা ছবি বেশ, পদ্য আছে, গল্প আছে। সুপাঠ্য—নিঃসন্দেহ!

সনাতন।

এই বইখানি ছেলেদের বর্ণপরিচয়ের বই। এতে শিশুরা গোড়া থেকেই নিজেদের দেশের ও জাতির অবনতির বিষয়ে ভাবতে পারবে। এর সঙ্গে যদি শিক্ষাদাতারা দেশের ও জাতির বিষয়ে একটু ভাল ক'রে ছেলেদের বুঝিয়ে দেন, তাহা হইলে সোণায় সোহাগা।

আত্মশক্তি।

আজ যদি এই গোটা দেশটার মন তৈরী করতে হয়, তাহ'লে "হাতে খড়ি" থেকে তার গোড়াপত্তন করতে হবে। যতীনবাবু

এই প্রথম পথ দেখিয়েছেন, সে জন্য আমরা বাস্তবিক আনন্দিত। তাঁর প্রতি ছত্রে দেশের জন্য একটা মমত্ববোধের ধারা ফুটে বেরিয়েচে।

* * * *

তারপর গ্রন্থকার প্রত্যেক পাঠের ভিতর দিয়ে কচি মনে দেশের জন্য যে মমত্ববোধের ছাপা অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেছেন বাস্তবিক তা অতুলনীয়। দু এক জায়গা উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারচি না, কিন্তু পুঁথি বেড়ে যায়—

* * * *

তারপর অধীন জাতির চিত্রটী বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ও চিত্তাকর্ষক। আমরা এই বইখানি বাংলা ভাষা-ভাষী প্রতি ঘরে দেখিতে চাই।

শঙ্খ।

হাতেখড়ি—ছেলেদের বর্ণপরিচয়ের বই। সুন্দর সুন্দর চিত্রে সুশোভিত। মায়েরা স্তন্য দুগ্ধ পান করাইবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করিতে থাকিলে যেমন ভবিষ্যৎ বংশে দেশাত্মবোধ সহজ ও স্বাভাবিক হয়, ছেলেদের বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তেমনি দেশাত্মবোধের শিক্ষা দিতে পারিলে জাতির চিত্ত দেশের দুঃখে স্বভাবতঃ কাঁদিয়া উঠে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় হাতেখড়ির সঙ্গে সঙ্গে দেশের কথা টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া ভাল করিয়াছেন। আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। স্বরাজের কথা, মনুষ্যত্বের কথা—জাতির কাছে হাতেখড়ির মারফতে দিতে পারিলে তাহা স্থায়ী হইবে।

মূল্য—পাঁচ আনা মাত্র।

সুলভ সংস্করণ—দেড় আনা মাত্র।

কলিকাতা—৭৯নং বলরাম দে ষ্ট্রীট
মেট্‌কাফ্ প্রেস্ হইতে
শ্রীশশিভূষণ পাল দ্বারা মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

প্রাপ্তি স্থান—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়
৬১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

উৎসর্গ

—:০:—

স্বদেশবৎসল

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত

মহাশয় শ্রীকরপেলবে

মহাত্মন্

পল্লীবাসীর অকৃত্রিম সুহৃদ, আর্ত্তের সহায়, দীনের বান্ধব আপনি। শত পল্লীবাসীর উন্মুক্ত হৃদয়ের উপর আপনার অবাধ অধিকার বিস্তৃত—তাই নিজ পল্লীর ছত্রহীন ভূপতি আপনি। অনশন-মারী-প্লাবনের অতীত, আপনার সেই পল্লীতীর্থের গন্ধহীন কুসুমও আপনার অঞ্জলির যোগ্য! এই সাহসে আপনার প্রাতঃস্মরণীয় নাম পল্লীশ্রীর সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া ধন্য হইলাম।

১১এ হরলাল মিত্র লেন
বাগবাজার—কলিকাতা
১৮ই শ্রাবণ, ১৩৩০।

স্নেহার্থী
যতীন্দ্র

উপহার

....

....

....

শ্রী.................................

তারিখ...................